শিয়া আলেম ও অধিকাংশ মুসলিম আলেমের মধ্যে বিরোধের বাস্তব চিত্র

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

সা'ঈদ ইসমাঈল

অনুবাদ :

মো: আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা :

আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1432

﴿ حقيقة الخلاف بين علماء الشيعة وجمهور علماء المسلمين ﴾

« باللغة البنغالية »

سعيد إسماعيل

ترجمة: محمد أمين الإسلام

مراجعة: أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যার প্রশংসা ব্যতীত কিতাবসমূহ সূচনা করা হয় না; সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল নবীদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের প্রতি।

অতঃপর: সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজের নিষেধ করা দীনের বৃহত্তর ভিত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবীদের সকলকে প্রেরণ করেছেন। আর তিনি যদি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের ব্যাপকতাকে ঘুটিয়ে নিতেন এবং তার জ্ঞান অর্জন ও আমল করার বাধ্যবাধকতাকে উপেক্ষা করতেন, তাহলে নবুয়তের ধারা বন্ধ হয়ে যেত, ধর্মবিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যেত, অজ্ঞতা প্রসার লাভ করত, পথভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ত, মূর্খতা বিস্তৃত হয়ে পড়ত, বিশৃঙ্খলা প্রকট আকার ধারণ করত, জনশূন্যতা বেড়ে যেত, দেশ আক্রান্ত হত, জনগণ ধ্বংস হত। আর তারা আর্তনাত দিবসের পূর্বে ধ্বংসের কারণ উপলব্ধি করতে পারত না।

এহইয়াউ উলুমিদদীন (إحياء علوم الدين)

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাযালী

সূচিপত্র

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি ....

এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য ....

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستهديه من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إلٰه إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ، اللّٰهُمَّ صل و سلم على نبينا و حبيبنا محمد و على آله و أصحابه و التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট হেদায়েত চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথপ্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবী, তাবে‘য়ী

এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করবে, তাদের সকলের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর।)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বলেন:

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٥﴾ [سورة آل عمران: ١٠٤-١٠٥]

“তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজের নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।”[1]

এই নগণ্য পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, সেসব ধর্মীয় মাসআলার ব্যাপারে খুব সাদাসিধে ও সংক্ষিপ্ত চিন্তাধারা পেশ

[1] সূরা আলে-'ইমরান: ১০৪ – ১০৫।

করা, যেসব মাসআলার ব্যাপারে শিয়া আলেমগণ অধিকাংশ মুসলিম আলেম ও বিজ্ঞজনদের সাথে মতবিরোধ করেছেন। বিশেষ করে আমি এই পুস্তিকাটি রচনা করেছি ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি জানেন যে, সেখানে এই দুই গোষ্ঠীর আলেমদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়েছে; কিন্তু তিনি এসব মতবিরোধের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে জানেন না এবং তার আগ্রহ রয়েছে বেশি সময় ব্যয় না করে এই দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে সাদামাটা চিন্তাভাবনা করার।

এই পুস্তিকাটি রচনার আরও লক্ষ্য হল, ঐসব ব্যক্তিদেরকে পর্যালোচনা করা, যারা এই দুনিয়া ও পরকালের সফলতার ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে এমন চূড়ান্ত অবস্থান গ্রহণ না করেই এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে হতবুদ্ধিদের মত অবস্থান গ্রহণ করেছে।

আমরা আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করি, যাতে তিনি কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, অন্যায় কাজের নিষেধ করা ও ঐক্যবদ্ধ থাকার যে নির্দেশ করেছেন, সে নির্দেশনা অনুযায়ী করা এই সামান্য চেষ্টা-সাধনা ও খেদমতটুকু গ্রহণ করেন।

যেমনিভাবে আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করি, যাতে তিনি আমাদের সকলকে তাঁর রহমত, ক্ষমা ও অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আমাদেরকে সততা ও হেদায়েত দান করেন ...। আমীন!

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

যখন সুপথ প্রদর্শনের জন্য মানব জাতির মাঝে ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে, তখন মানুষের মধ্য থেকে একটি বাছাইকৃত দল তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তারা তার প্রচার, প্রসার ও তার শত্রুদের প্রতিরোধে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। অতএব তার ফলে ইসলাম খুব দ্রুতগতিতে জনবহুল অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের এই প্রভাবের কারণে জাতীয়তাবাদি ও ধর্মীয় ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে হিংসুকগণ হিংসা করতে লাগল এবং বিদ্বেষ পোষণকারীগণ বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিল; বিশেষ করে সংকীর্ণ চিন্তা ও জ্ঞানের অধিকারী ইয়াহূদীগণ। অতঃপর তারা বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে শুরু করল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা ও মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা ছড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করল; তবে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমদের ঈমান এতই শক্তিশালী ছিল যে, এসব ফিতনা ও ষড়যন্ত্র তাদের ঈমান বা বিশ্বাসকে এতটুকু

নড়বড়ে করতে পারে নি। কিন্তু যখন মুমিনদের প্রথম প্রজন্ম অতিবাহিত হয়ে গেল; সকল জাতি ও ধর্ম থেকে একটা বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল এবং ইসলামী উম্মাহর গণ্ডি সম্প্রসারিত হল, তখন থেকে বিশেষ করে ইয়াহূদী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব লাভ করল। এই প্রসারতার সুযোগে আবদুল্লাহ ইবন সাবা ও তার অনুসারীদের তৎপরতা ব্যাপক হারে চলতে থাকে এবং সে তার আহ্বানে প্রাথমিকভাবে সেখানে ব্যাপক সাড়া পায়, যে অঞ্চলের অধিবাসীগণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি। অতঃপর তার ঘৃণ্য দাওয়াতি তৎপরতা অপরাপর ইসলামী ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে।[2]

খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার যুগে সাহাবীদের বিশাল সংখ্যা বিদ্যমান ছিল; মুসলিমদের মধ্য থেকে বিজ্ঞজনেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি (খলিফা) আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, অতঃপর ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ হয়

[2] ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শিয়া ওয়াস সুন্নাহ (الشيعة و السنة), পৃ. ১৭ – ২৪।

সর্বসম্মতভাবে; কোনো একজন ব্যক্তিও দাবি করেনি যে, আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন অন্যদের চেয়ে খেলাফতের যোগ্যতম অধিকারী এবং তিনি হলেন নিষ্পাপ। কিন্তু যখন ইয়াহূদী ষড়যন্ত্র এবং গোত্রীয় ও জাতিগত বিদ্বেষ কার্যকর হতে শুরু করল এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের শেষের দিকে তার ভয়াবহতা প্রকট আকার ধারণ করল, তখন এমন কিছু ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটল, যে বলে: আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এবং হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বংশের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি হলেন অন্যান্যদের চেয়ে ইসলামী খেলাফতের অতি উত্তম উত্তরাধিকারী এবং তাদের মধ্যেই খেলাফত কিয়ামত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

আর এই দাওয়াতের অস্তিত্ব পাওয়া যায় পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনের উর্বর মাটিতে; বিশেষ করে হোসাইন রা. পারস্য সম্রাট এযদাজারদের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, যার সিংহাসন উল্টিয়ে দিয়েছিল ইসলামের বিজয়ী সৈন্য বাহিনীগণ।[3]

[3] আলী হাসান, পৃ. ২৩০ - ২৩১

সম্ভবত চতুর্থ ইমাম থেকে হোসাইনের বংশের মধ্যে শিয়াদের ইমামগণকে প্রাথমিকভাবে সীমিতকরণের এটাই কারণ।

আর আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবূ বকর, ওমর ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের চেয়ে খেলাফতের অধিক হকদার তথা উপযুক্ত বলে প্রথম বারের মত যে দাবির সূচনা হয়, তা ছিল একটা রাজনৈতিক দাওয়াতের মত এবং তা মুসলিমদের কাতারে ফিতনার অবস্থান তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু তা ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় দাওয়াতে রূপান্তরিত হতে বেশি বিলম্ব করেনি; যে ইসলামী শিক্ষাকে অধিকাংশ মুসলিম আলেম অত্যন্ত যত্নসহকারে সংশোধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছেন।

যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কিছু সংখ্যক দুষ্ট লোকের ব্যবস্থাপনায় এই বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে অনেক মুসলিমকে বলি হতে হয়েছিল; বিশেষ করে সাধারণ মুসলিমগণ, যারা তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু অন্ধ অনুকরণ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তথ্য-উপাত্তের উপর নির্ভর করত। যেমনিভাবে বলি হয়েছেন এমন কিছু সংখ্যক আলেমও, যারা তাদের সামনে সৃষ্টি হওয়া ভয়াবহ পক্ষপাতমূলক বিষয়

থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ব্যক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হতে পারে নি। এর ফলে আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের অংশবিশেষের পক্ষ সমর্থন করে শিয়া মাযহাব নামে একটি মাযহাবের উৎপত্তি হয়। তারা আবার বিভক্ত হয় বহু দল ও উপদলে। তাদের মধ্যে একটি দল হল যায়েদীয়া, যারা (আকিদাগত) দূরত্বের দিক থেকে অধিকাংশ মুসলিম আলেমের কাছাকাছি। অতঃপর ইসমাঈলীয়া, নুসাইরিয়্যা ও দ্রূয; আর এরা এমন বাড়বাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা আলী রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুকে ইলাহ ও স্রষ্টা বানিয়ে নিয়েছে। অতঃপর ইমামীয়া ও দ্বাদশ জা‘ফরীয়া[4], অচিরেই এই আলোচনার মধ্যে তাদের ব্যাপারে জানতে পারব। আর এই জন্যই অচিরেই

[4] আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্ শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدرية), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪ ; আল-হোসাইনী আবদুল্লাহ, আল-জুযুর আত-তারিখীয়া লিন্ নুসাইরীয়া (الجذور التاريخية للنصيرية), পৃ. ৭৩ - ১৩৪ ; আহমদ আল-ফাউযান, আদওয়াউন ‘আলাল ‘আকিদাতিদ দুরযীয়া (أضواء على العقيدة الدرزية), পৃ. ৯ - ১৮ ; তাবতাবায়ী, পৃ. ৭৫ - ৮২ ; আবদুল হোসাইন আল-‘আসকারী, আল-‘উলুবীউন আউ আন-নুসাইরিয়্যন (العلويون أو النصيريون).

আল্লাহর ইচ্ছায় উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করে সৃষ্ট অধিকাংশ মুসলিম আলেম ও জা‘ফরীয়া আলেমদের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধের উপর রচিত এই পুস্তিকাটি একটি গরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে।

আল-কুরআনুল কারীম

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকারী মাযহাব জা‘ফরীয়া আলেমগণ বলেন: আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা সতের হাজার, যা ‘আল-উসূল মিনাল কাফী’ (الأصول من الكافي) নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[5] আর ‘আল-কাফী’ নামক গ্রন্থ যা শিয়াদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদিসের কিতাব, তাতে বর্ণিত হয়েছে:

“মিথ্যাবাদী ব্যতীত কোন মানুষ এই দাবি করতে পারে না যে, সে আল-কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবে তার পরিপূর্ণ সংকলন করেছে; আর আল্লাহ তা‘আলা তাকে যেভাবে নাযিল করেছেন, ঠিক সেভাবে তা সংকলন ও সংরক্ষণ আলী ইবন আবি

[5] আল-কাফী মিনাল উসূল (الكافي من الأصول), ২য় খণ্ড, প্রকাশকাল: **১৯৬১**, পৃ. ৬৩৪; ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শিয়া ওয়াস সুন্নাহ (الشيعة والسنة), পৃ. ৭৭ – ১৫২।

তালিব আ. ও তাঁর পরবর্তী ইমামগণ ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে নি।”[6]

শিয়া আলেমগণ তাদের অনুসারীদেরকে মুসলিমদের হাতে সংরক্ষিত কুরআন পাঠের সুযোগ ততক্ষণ পর্যন্ত দিয়েছেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের নিকট এমন প্রশিক্ষক আসবেন, যিনি তাদেরকে তাদের ধারণা অনুযায়ী শিয়াদের পরিপূর্ণ কুরআন শিক্ষা দেবেন।[7]

তবে মুসলিম বিদগ্ধ আলেমগণ দৃঢ়তার সাথে বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুরআন সংকলন করেছেন তার ধারবাহিকতা ও পরিপূর্ণ অবস্থাসহ তিলাওয়াত ও মুখস্থকরণ উভয়ভাবেই। অতঃপর যায়েদ ইবন সাবেত রা. আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফতকালে একই গ্রন্থের মধ্যে সংকলন ও

[6] আল-কাফী মিনাল উসূল (الكافي من الأصول), ১ম খণ্ড, প্রকাশকাল: ১৯৬৮, পৃ. ২৮৮।

[7] আল-কাফী মিনাল উসূল (الكافي من الأصول), ২য় খণ্ড, প্রকাশকাল: ১৯৬১, পৃ. ৬৩৩; মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব, আল-খুতুত আল-‘আরিদা (الخطوط العريضة), পৃ. ১১।

সংরক্ষণ করেন।[8] আর ওসমান ইবন ‘আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফতকালে কুরাইশদের ভাষায় কুরআন লিপিবদ্ধের কাজ সমাপ্ত হয়, যে ভাষায় তা নাযিল হয়েছে এবং ইসলামী শহরগুলোতে তা সার্বজনীনভাবে প্রচলনের কাজ সম্পন্ন হয়।[9] আর এই গ্রন্থটি বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে হেদায়েত ও দলিল-প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

তবে এর সাথে প্রসিদ্ধ সাতটি কিরাতের সম্পর্ক রয়েছে; তবে তার (কিরাতের) বিভিন্নতার পরিমাণ খুবই নগণ্য ও সাদাসিধে ধরনের, যার উপর ভিত্তি করে অর্থের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। আর এই ধরনের ইখতিলাফ তথা বিভিন্নতার দৃষ্টান্ত হল: مالك أو ملك، و تعلمون أو يعلمون، و يغفرلكم أو نغفرلكم ইত্যাদি।[10]

[8] সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭৭ – ৪৭৮।

[9] সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭৮ – ৪৮০।

[10] মান্না‘উল কাত্তান, মাবাহেসু ফী ‘উলুমিল কুরআন (مباحث في علوم القرآن), পৃ. ১৭০ – ১৮৫।

মুসলিম আলেমগণ আল-কুরআনুল কারীম কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [سورة الحجر: ٩]

“আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক।”[11]

তিনি আরও বলেন:

﴿ لَا تُحَرِّكۡ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهِۦٓ ١٦ إِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهُۥ وَقُرۡءَانَهُۥ ١٧ ﴾ [سورة القيامة: ١٦-١٧]

“তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা তার সাথে সঞ্চালন করো না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।”[12]

তিনি আরও বলেন:

[11] সূরা আল-হিজর: ৯।

[12] সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৬ - ১৭ ।

﴿وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ ٤١ لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢﴾ [سورة فصلت: ٤١-٤٢]

"আর এটা অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ; কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না — অগ্র থেকেও নয়, পশ্চাত থেকেও নয়। তা নাযিল হয়েছে প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ নিকট থেকে।"[13]

আল্লাহ তা'আলা তার সংরক্ষণ ও হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে তা হতে পারে সকল স্থানের ও সকল যুগের মুসলিমদের জন্য আলোকবর্তিকা ও হেদায়েত। আর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সাথে এই গ্রন্থটির তুলনা করলে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে যে, এই কিতাবটি সংরক্ষণ করার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির মত করে পূর্ববর্তী কোন কিতাব সংরক্ষণের জন্য এমন প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ হয়নি। সুতরাং সে সমস্ত গ্রন্থের নীতিমালা বিদ্যমান ও সংরক্ষিত রয়েছে সত্য, কিন্তু মানুষ তার থেকে কিছু পরিবর্তন করে তার আকৃতিগত ও অর্থগত বিকৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

[13] সূরা ফুসসিলাত: ৪১ – ৪২।

আর মুসলিম সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ আলেমগণ যে ব্যক্তি আল-কুরআন বিকৃত বলে বিশ্বাস করে, তাকে গোটা কুরআন অস্বীকারকারী ব্যক্তির মত কাফির বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[14] কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٨٥ ﴾ [سورة البقرة: ٨٥]

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে, তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে অপমান এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে অনবহিত নন।"[15]

[14] ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শিয়া ওয়াস সুন্নাহ (الشيعة و السنة), পৃ. ১৪১ – ১৪৭।

[15] সূরা আল-বাকারা: ৮৫।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা নিজে নিজেই উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন যে, সূরাসমূহের শুরুতে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ ব্যতীত আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার দুইশত ছত্রিশ মাত্র। এই জন্য শিয়া আলেমগণ বলে থাকে যে, এই কুরআন পরিপূর্ণ নয়। আমরা আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, আমরা কি জা‘ফরীয়া আলেমদেরকে বিশ্বাস করব, নাকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাকে বিশ্বস করব, অথচ তিনি তার সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? অপরদিকে মুসলিম আলেমগণ বিশ্বাস করেন যে, আল-কুরআন সকল প্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত; আর তাতে যে কোন ধরনের বিকৃতি বা পরিবর্তন সংঘটিত হলে, তা দ্রুত উদঘাটন হয়ে যাবে।

সম্ভবত কিছু সংখ্যক শিয়া আলেম শিয়া দর্শনকে হেফাযত করা বা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ‘তাকীয়া’ আকিদার আড়ালে আল-কুরআন বিকৃতির আকিদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করে। সুতরাং কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশের পূর্বে তাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে।

সুন্নাত ও হাদিস

জা‘ফরীয়া আলেমগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন এবং নিষ্পাপ শিয়া ইমামগণ যা বলেছে, তাকে সুন্নাহ বা হাদিস বলে বিবেচনা করে।[16] আর আমরা যদি ‘আল-কাফী’ নামক গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি দেই, যে গ্রন্থটিকে আত-তাবতাবায়ী ‘শিয়া জগতের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ হাদিসের গ্রন্থ’ বলে বিবেচনা করেছেন[17], তবে আমরা দেখতে পাব যে, অধিকাংশ হাদিসের ক্ষেত্রে বলা হয় না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; বরং বলা হয়, ইমাম বলেছেন: এইরূপ এইরূপ। আর অধিকাংশ হাদিসের কোন সনদ নেই।

আর আমরা যখন ঐসব হাদিসের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, তখন আমরা তার অধিকাংশগুলোকে আল-কুরআনুল কারীমের সাথে বিরোধপূর্ণ হিসেবে পাই। আর সেখানে

[16] তাবতাবায়ী, পৃ. ৯৩; ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান, দ্বিতীয় ধারা।

[17] তাবতাবায়ী, পৃ. ১১০।

সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, যে মানদণ্ডের সুস্পষ্ট গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে হাদিসসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়, তা মূলত শিয়া দর্শন ও চিন্তাধারাকেই সমর্থন করে অথবা কমপক্ষে তার সাথে বিরোধ করে না। আর শিয়া আলেমদের মধ্য থেকে অন্য দুই এক জনের মত করে আত-তাবতাবায়ী দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, হাদিসে নববীর মধ্যে সেই হাদিসই সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, যা নিষ্পাপ ইমামদের বর্ণনার পরে উল্লেখ করা হয়; যদিও ইমাম তার এমন উত্তরাধিকার রেখে মারা যান যে, তিনি তার বয়সের নবম বা অষ্টম অথবা পঞ্চম অতিক্রম করেন না।[18] সুতরাং উদাহরণস্বরূপ এমন হাদিসের কথা বলা যায়, যা আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন এবং ইমাম বুখারী রহ. তা তাঁর সহীহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন; অথচ জা‘ফরীয়া আলেমগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন, যদি সে হাদিস শিয়া আকিদার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়; যেমন: ‘মুত‘আ বিয়ে নিষিদ্ধের হাদিস’। অপরদিকে, যখন হাদিসটি শিয়া মতবাদকে সুদৃঢ় করবে,

[18] তাবতাবায়ী, পৃ. ৯৪, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১।

তখন যিনি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টি না দিয়েই তা খুব দ্রুততার সাথে তারা তা গ্রহণ করবে।[19]

অপরদিকে মুসলিম আলেমগণ সুন্নাহর পরিচয় দেন এইভাবে, ‘সুন্নাহ’ হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অথবা করেছেন অথবা স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর সৃষ্টিগত গুণাবলীসমূহ।[20]

আর সাধারণভাবে সেখানে দু’টি পদ্ধতি রয়েছে, যার উপর অধিকাংশ মুসলিম আলেম হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য নির্ভর করে থাকে:

প্রথমত: বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের জন্য সনদ পরীক্ষা করা। এই জন্য পরিচয়হীন অস্পষ্ট বর্ণনাকারীদের সততা অথবা দোষ-ত্রুটি জানতে অক্ষম হলে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হাদিসসমূহ প্রত্যাখ্যান করা হয়।

[19] তাবতাবায়ী, পৃ. ৯৪।

[20] আজমী, পৃ. ৩।

দ্বিতীয়ত: হাদিসের মতন পরীক্ষা করা, যাতে তার বক্তব্য কুরআন অথবা সনদের দিক থেকে শক্তিশালী অপরাপর হাদিসমূহের বিপরীত না হয় ...।[21]

সনদের এই মানদণ্ডে হাদিসসমূহ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাদিস বিশেষজ্ঞগণ একমত পোষণ করেছেন যে, সুন্নাতে নববীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য দু'টি গ্রন্থ হল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।[22]

যেমনিভাবে আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর পরই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আল-কুরআনুল কারীম এক খণ্ডে সংকলন সমাপ্ত হয়েছে; কিন্তু ইলমে হাদিসের সংকলন শুরু হয়েছে হিজরি প্রথম শতকের একেবারে শেষের দিকে।[23] আর এই সংকলনের পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে; তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, হাদিস শাস্ত্র বিস্তারিতভাবে ইসলামী শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তাকে একটি সমন্বিত

[21] আজমী, পৃ. ৩২ – ৭২।

[22] ফাতাওয়া, খণ্ড (১৭), পৃ. ১৮ এবং আজমী, পৃ. ৮৭, ৯৬।

[23] আজমী, পৃ. ২৫।

অবকাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার অনুকরণ ও অনুসরণ করা মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ ও সাধারণভাবে আবশ্যক; এমনকি আল্লাহর সাথে ও জনগণের সাথে তার (মুসলিম ব্যক্তির) নিবিড় সম্পর্কের প্রয়োজনেও তার অনুকরণ জরুরী। জীবনের সাথে সুন্নাতে নববীর সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের প্রচণ্ড আগ্রহ থাকার কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন হাদিসের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এবং তার বড় উৎস। আর এ কারণেই সেই যুগে বহু খণ্ডে হাদিস সংকলনের খুব বেশি প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাছাড়া কিছু সংখ্যক বড় মাপের সাহাবী কুরআনের সাথে হাদিসের মিশ্রণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রথম দিকে আল-কুরআনুল কারীম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করতেন; যে ধরনের মিশ্রণ ঘটেছিল তাওরাত এবং ইঞ্জিলে।

হে আমার ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি, বিশেষভাবে (সুন্নাত ও হাদিসের দুই পক্ষ থেকে প্রদত্ত) দু'টি সংজ্ঞার কোন সংজ্ঞাটি অধিক সত্য ও বাস্তব? যখন আমরা জানি যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴾ [سورة الأحزاب: ٤٠]

“মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।”[24]

সুতরাং তাঁর পরে কারো পক্ষে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ওহী লাভ করা সম্ভব নয় এবং সমীচীনও নয়। কারণ, আল্লাহ প্রদত্ত ওহী নবী ও রাসূলদের জন্য নির্ধারিত। আর শিয়া আলেম যখনই রাসূলের কথা ও শিয়া ইমামদের কথাকে এক পাল্লায় ওজন করে, তখন সে যেন বলতে চায়, ইমামগণও নবী ও রাসূলদের মত আল্লাহ প্রদত্ত ওহী লাভ করে; আর এর (এই চিন্তার) মধ্যে কুরআনের সাথে সুস্পষ্ট বিরোধ রয়েছে। আর যখন কথাটি এমন হয় যে, ঐসব ইমামগণ শুধু ইলহাম প্রাপ্ত হন, তাহলে তো ইলহাম এক জিনিস, আর ওহী হল আরেক জিনিস। সুতরাং ওহীর অনুসরণ আবশ্যক; আর ইলহামের মধ্যে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ রয়েছে এবং তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। তাছাড়া নবী ও রাসূলগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ইলহাম ওহীরই অংশবিশেষ।

[24] সূরা আল-আহযাব: ৪০।

ইজমা

ইজমার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে শিয়া আলেমদের পক্ষে ও বিপক্ষে অভিমত রয়েছে। সুতরাং ইজমা দ্বারা যখন তাদের মতামতকে সমর্থন দেবে, তখন তারা ইজমাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ আত-তাবতাবায়ী'র ব্যবহার করা অনেক কথা: "সবটাই শিয়া মতবাদ ও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত ..." এবং "... সকলেই তাকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন"।[25] [কারণ, এগুলো তাদের মতের সমর্থনে হয়েছে, তাই তারা তখন ইজমা স্বীকার করছে; নতুবা নয়]

অপরদিকে শিয়া আলেমগণ ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করে; অতএব উদাহরণস্বরূপ:

১. তারা বলে, সাহাবীগণের সংখ্যা হাজার হাজার; তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং দশ জনেরও কম সংখ্যক সাহাবী

[25] তাবতাবায়ী, পৃ. ৪০।

তাঁর সুন্নাতের উপর বলবৎ ছিলেন। এই জন্য তারা এই কম সংখ্যক সাহাবীকেই তাদের উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে অধিকাংশ সাহাবীর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

২. তারা বিশ্বাস করে যে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময় ও স্থানে কোটি কোটি মুসলিম ইসলাম ও ঈমানের গুণগত পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। কারণ, তারা শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলাম ও ঈমানের একটি অন্যতম রুকনকে (স্তম্ভ) প্রত্যাখ্যান করে; আর তা হল ইমামত তথা শিয়া ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস। অর্থাৎ বার জন নিস্পাপ ইমামের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাদের ধারণা মতে, যাদের ব্যাপারে রাসূল বক্তব্য দিয়েছেন যাতে তাদের জন্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব নির্ধারিত হয় এবং তারা একের পর এক তার উত্তরাধিকারী হবে। [অথচ এটা মিথ্যাচার]

৩. তারা আল-কুরআনুল কারীমের বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে; অথচ সকল মুসলিম আলেম একবাক্যে তা বিশ্বাস করেন।

আর অধিকাংশ মুসলিম আলেম ইজমাকে কুরআন ও সুন্নাহর পরে ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন।[26] সুতরাং হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হল যার সনদ মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেমন সাহাবীদের একদল হাদিস বর্ণনা করেছেন; আর তাঁদের নিকট থেকে তাবেয়ীদের একদল তা বর্ণনা করেছেন।[27] আর উদ্ভাবিত সমাধান ও ফতোয়ার মধ্যে সবচেয়ে উন্নতমানের হল যার ব্যাপারে আলেমগণ ইজমা বা ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[28] কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বলেন:

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [سورة آل عمران:١٠٣]

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[29]

[26] ফাতাওয়া, খণ্ড (১৯), পৃ. ৫ - ৮, ১৯২ - ২০২।

[27] ইবনু আছীর আল-জাযারী, জামে'উল উসূল ফী আহাদীসের রাসূল (جامع الأصول في أحاديث الرسول), ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০ - ১২৬

[28] ফাতাওয়া, খণ্ড (৯), পৃ. ২৬৭ – ২৭২।

[29] সূরা আলে 'ইমরান: ১০৩।

আর আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকদেরকে অপছন্দ করেন, যারা তাদের দীনকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে; সুতরাং তিনি তাঁর নবীকে উদ্দেশ্যে করে বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ١٥٩ ﴾ [سورة الأنعام: ١٥٩]

"যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।"[30]

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ... عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة» (أخرجه الترمذي و أحمد).

[30] সূরা আল-আন'আম: ১৫৯।

“আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবী ও তাদের পরবর্তীদের (তাবেয়ীদের) অনুসরণের নির্দেশ দিচ্ছি ... তোমাদের কর্তব্য হল সংঘবদ্ধভাবে থাকা এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকা। কারণ, শয়তান একা ব্যক্তির সাথে থাকে; আর সে দুইজন থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি জান্নাতের কল্যাণ লাভ করতে চায়, সে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।”[31]

আর কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম জামাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাদের আলেমগণ; সাধারণ মুসলিমগণ উদ্দেশ্য নয়, যারা ইসলামের মৌলিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন ব্যতীত শুধু অনুসরণ ও অনুকরণ নির্ভরশীল।

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:«لا تجتمع أمتي على خطأ»

(আমার উম্মত ভুলের উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না)।

[31] তিরমিযী, ফিতান, বাব নং- ৭, হাদিস নং- ২১৬৫ ; আহমদ, ইবনু আছীর আল-জাযারী, জামে‘উল উসূল ফী আহাদীসের রাসূল (جامع الأصول في أحاديث الرسول), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৬৯।

তিনি আরও বলেন: «لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة»

(আল্লাহ আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না)।”[32]

তিনি আরও বলেন:

«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»

(মুসলিমগণ যা উত্তম মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও উত্তম)।[33]

আর তা এই জন্য যে, মুজতাহিদ তথা গবেষকদের প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কোন হুকুম বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের ঐক্যমত পোষণ দ্বারা হকের উপর তাদের ইজমাই অর্জিত হয়।[34]

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর উম্মত অচিরেই তিহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে; তন্মধ্যে একটি দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত, আর বাকি সবগুলো জাহান্নামী। আর

[32] রাসূলের বাণী: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না) -এর শাব্দিক উদ্দেশ্যের আলোকে সাখাবী এই অর্থটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

[33] সাখাবী এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

[34] ‘ইজ্জুদ্দীন বালীক, মিনহাজুস্ সালেহীন (منهاج الصالحين), পৃ. ৫৪৪।

যখন তাঁকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তার জওয়াবস্বরূপ প্রাপ্ত একটি বর্ণনার মর্মার্থ হল, সে দলটি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত দল; আবার অন্য বর্ণনা অনুযায়ী সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল হল 'জামাত' অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।[35]

হে ভাই ও বোনেরা! তোমরা কি বিশ্বাস করবে না যে, নিয়ম-কানুনের যে কোন কার্যকরী মানদণ্ড নির্ভর করে তার যথাযথ ব্যবহার ও নির্ভেজাল ফলাফলের উপর। নতুবা এক বার তা গ্রহণ করা হবে; আরেক বার তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর এই কারণে এমন কোন ফকীহর (আইনবিদ) উপর নির্ভর করা সম্ভব হবে কি, যিনি মূলত দলিল ব্যবহার করেন কোন বস্তু নিজের জন্য বৈধ করার জন্য, যা অন্যদের জন্য সেই বস্তুটিকে অবৈধ করে দেয়? অথবা যিনি নিজের পক্ষে দেয়া দলিল যখন তার বিপক্ষে চলে যায়, তখন তিনি তার দলিলের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেন? আর যখন তার পক্ষে থাকে, তখন তার উপর নির্ভর করেন?

[35] মিনহাজুস্ সুন্নাহ (منهاج السنة), ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২ – ১২৫।

হে ভাই ও বোনেরা! মনে কর, কোন মুসলিম ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার পথ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন তার জওয়াব দিল কমপক্ষে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল যারা ঐ পথ সম্পর্কে ভালভাবে জানেন; কিন্তু অপর একজন যদি এমন বর্ণনা দেয়, যা উপরোক্ত বর্ণনার বিপরীত, এমতাবস্থায় সেই মুসলিমকে তুমি কি উপদেশ দিবে? সে কি দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের বক্তব্যের অনুসরণ করবে, নাকি ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকারী একক ব্যক্তির কথার অনুসরণ করবে? যদি ধরে নেয়া হয় যে, প্রশ্নকারী ব্যক্তি ঐসব ব্যক্তিদের কারো সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং তার কাছে উভয় বর্ণনাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়

অতঃপর কি সমাধান হবে, যদি পরিষ্কার হয় যে, ভিন্ন অভিমত পেশকারী ব্যক্তির বর্ণনার মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ নিহিত রয়েছে এবং বাকিদের বর্ণনায় এই রকম ব্যক্তিস্বার্থ নেই? আবার কিইবা সমাধান হবে, যদি তুমি জানতে পার যে, স্বতন্ত্র রায় পেশকারী ব্যক্তি অচিরেই প্রশ্নকারী ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ পোষণ করবে, যখন সে তার বর্ণনা বা পরামর্শের অনুসরণ করবে না; যে সময়ে বাকিদের অভিমত হল যে, তাদের মতের বিরোধিতা কারী বিদ্বেষ ও ঘৃণার উপযুক্ত হবে না?

ইসলামের রুকন ও ঈমানের রুকন

দ্বাদশ ইমামের অনুসারী জা'ফরীয় আলেমগণ বলেন যে, মুসলিম জাতিকে পরিচালনার জন্য বংশগত প্রথা বা নিয়ম-কানুনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রুকন (ভিত্তি) এবং তার মানগত অবস্থান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মত; যেমনিভাবে তার প্রতি জোর দিয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায়। সুতরাং জা'ফরীয় আলেমগণের নিকট ইমামত ঈমানের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ রুকনের নাম, যার মাঝখানে ফেরেশতা এবং তাকদিরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাসের কথা আসে না। আর শাহাদাতাঈন তথা দুই সাক্ষ্য, সালাত (নামায), সাওম (রোযা) ও হাজ্জের মত এটাও (ইমামত) ইসলামের অন্যতম রুকন।[36]

অন্যদিকে অধিকাংশ মুসলিম আলেম কুরআন অথবা সুন্নাহর মধ্যে ইমামত বা নেতৃত্ব সম্পর্কে শিয়া ধারণার বাস্তবতা না থাকার বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন; আর যারা ইসলামে

[36] ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান, দ্বিতীয় ধারা, অনুচ্ছেদ- ৫ ; আসেফী, আস-সালাত, পৃ. ২৩ – ২৫ ; আল-কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০।

খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থায় এবং দীনের বুঝের ক্ষেত্রে ব্যাপক বংশগত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য দেন তারা সে বক্তব্যও নাকচ করে দেন। বরং তারা এই বংশগত প্রথা যা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে, তার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তার প্রতি জোর দেন। সুতরাং আল-কুরআনুল কারীম মুমিনদের প্রশংসায় বলে:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨ ﴾ [سورة الشورى: ٣٨]

“যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।”[37]

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

﴿ فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ

[37] সূরা আশ-শূরা: ৩৮।

فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ [سورة آل عمران: ١٥٩]

“আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে; যারা (আল্লাহর উপর) নির্ভর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।”[38]

মুসলিম আলেমগণ এই কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ইসলামকে পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়েছে: এই কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য বা ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; সালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা; যাকাত প্রদান করা; রমযান মাসে রোযা রাখা এবং বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছতে সক্ষম ব্যক্তির হাজ্জ

[38] সূরা আলে ইমরান: ১৫৯।

পালন করা।[39] যেমনিভাবে মুসলিম আলেমগণ এই কথার উপরও ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ঈমানের মূল ভিত্তি হল: আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং পরকাল ও তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।[40]

কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি আল-কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে, তবে সে এমন একটি আয়াতও পাবে না, যা শিয়া আলেমগণ এই বংশগত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতার ব্যাপারে যে বক্তব্য দেয় তাকে সমর্থন করে। আর যে শিশু তার নবম অথবা অষ্টম বছর বয়সে তার (শাসনব্যবস্থার) উত্তরাধিকারী হবে, ...। আর কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ সুন্নাহ তথা হাদিস অধ্যয়ন করে, তবে সেও একই ফল দেখতে পাবে। [অর্থাৎ বংশগত শাসনব্যবস্থার অসারতা]

[39] ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ্দীন আন-নববী, মিনাল আরবা'ঈনা আন-নববীয়া (من الأربعين النووية), (চল্লিশ হাদিস), পৃ. ৩৫।

[40] ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ্দীন আন-নববী, মিনাল আরবা'ঈনা আন-নববীয়া (من الأربعين النووية), (চল্লিশ হাদিস), পৃ. ৩০।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আমাদের জন্য কি আল-কুরআনুল কারীম ও নির্ভরযোগ্য সুন্নাহ থেকে প্রদত্ত সুস্পষ্ট দলিলসমূহ দ্বারা উপস্থাপিত অধিকাংশ মুসলিম আলেমের মতামতকে সত্য বলে মেনে নেয়া উত্তম হবে; নাকি আল-কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর সাথে বিরোধপূর্ণ শিয়া আলেমদের মতামত ও বক্তব্যের অনুসরণ করাটা উত্তম হবে? এই প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার পূর্বে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হল এক আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা এবং এই নশ্বর পৃথিবীতে মুক্তি ও চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনে সফলতার জন্য প্রকৃত সত্য নিয়ে গবেষণা করা।

হে ভাই ও বোনেরা! আমাদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হল, আমরা যাতে ভুলে না যাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١٣٦ ﴾

[سورة النساء: ١٣٥ – ١٣٦]

“হে মুমিনগণ! তোমারা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমারা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সব খবর রাখেন। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর; আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখেরাত তথা পরকালকে প্রত্যাখ্যান করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।”[41]

[41] সূরা আন-নিসা: ১৩৫ – ১৩৬।

ইমামত বা নেতৃত্ব সম্পর্কে শিয়া ধারণা

শিয়া আলেমগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করার মত তথাকথিত ইমামত বা নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখাটা ঈমানের অন্যতম রুকন। অর্থাৎ শিয়া আলেমগণের নিকট ইমামত মানে গোটা মুসলিম জাতির জন্য আধ্যাত্মিক, শিক্ষা, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বংশগত শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য ধারাবাহিকভাবে বার ইমামের ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে। আর এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে ফাতেমা যাহরার স্বামী এবং তার দুই ছেলে হাসান ও হোসাইনের মধ্যে। অতঃপর সীমাবদ্ধ থাকবে হোসাইনের বংশের একাংশের মধ্যে, যিনি পারস্য সম্রাট এযদাজারদের কন্যা শাহবানুকে বিয়ে করেছেন; যে পারস্য সম্রাটের সিংহাসনকে খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের আমলে মুসলিম সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।[42] আর উদাহরণস্বরূপ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের ভাষ্য হল: “ইরানের রাষ্ট্রীয়

[42] তাবতাবায়ী, পৃ. ১৯০ – ২১১।

ধর্ম হল ইসলাম এবং দ্বাদশ জা'ফরী মাযহাব; আর এই ধারাটি চিরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয়।"[43]

আর ইমামতের রুকনটি তাদের বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এইভাবে যে, ঐসব ইমামগণ নিষ্পাপ এবং তারা আল্লাহর মত অদৃশ্য জগতের জ্ঞান রাখে; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাদের মৃত্যুর সময় সম্পর্কে তাদের (আগাম) জ্ঞান। আর ইমামদের অন্ধ আনুগত্য করা একান্ত জরুরি; "মর্যাদার বিষয়টি এমন যে, যখন এই বিষয়টি ইমামের নির্দেশ বা কাজ হয়, তখন আল্লাহর ইবাদত করা জরুরি হয় না"।[44] আর এই ক্ষেত্রে খোমেনী বলেন: "ইমামগণ এমন মর্যাদাসম্পন্ন, যাদের মধ্যে ভুল-ত্রুটি অথবা অবহেলা আছে বলে আমরা কল্পনা করি না এবং আমরা বিশ্বাস করি মুসলিমদের স্বার্থ ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ..."[45]; আর এই আকিদাটিও ঈমানের আবশ্যকীয় বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এইভাবে যে, "ইমামদের জন্য রয়েছে আধ্যাত্মিক অবস্থান ও সকল সৃষ্টির উপর সৃজনশীল খেলাফত বা

[43] ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান, বারতম ধারা।

[44] আল-মাকতাবাতুল-ইসলামীয়া আল-'উযমা (المكتبة الإسلامية العظمى), পৃ. ৬।

[45] ইমাম খামেনী, আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়া (الحكومة الإسلامية), পৃ. ৯১।

রাজত্ব, এমনকি সৃষ্টির সকল অণু-পরমাণু তাদের বশ্যতা স্বীকার করে; আর শিয়া আকিদার অন্যতম বুনিয়াদী বিষয় হল, ইমামদের আধ্যাত্মিক অবস্থানে আল্লাহর নিকটতম কোন ফেরেশতা, নবী ও রাসূল পৌঁছাতে পারে না।"[46] আর এই বিশ্বাসের অধীনে আরও যা অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হল: মুসলিমদের সকল খলিফা, প্রশাসক ও বিচারকগণ তাগুত, যতক্ষণ না তারা জা'ফরী মতবাদের অনুসারী হবে; এমনকি তাদের নিকট বিচার প্রার্থনা করে মামলা-মকদ্দমা করাও বৈধ নয়।[47] এই জন্য আমরা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টকে উদ্বুদ্ধ করতে দেখতে পাই যে, "ইসলামী প্রজাতন্ত্রের মূলনীতিমালা ও রাষ্ট্রের সরকারী মাযহাবের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসভাজন হয়ে ..." যেমনিভাবে এর উপর বক্তব্য প্রদান করে সংবিধানের ১১৫তম ধারা এবং শপথে পড়া হয়, "আমি সরকারী মাযহাবের সংরক্ষক হব" যার বিবরণ সংবিধানের ১২১তম ধারায় এসেছে।

জা'ফরীয়দের বাইরের বিচারকদের নিকট অথবা জা'ফরীয় ব্যতীত অন্যের শরীয়তের নিকট নিরাপত্তাহীনতার কারণে সংবিধানের ৭২

[46] ইমাম খামেনী, আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়া (الحكومة الإسلامية), পৃ. ৬৪।

[47] ইমাম খামেনী, আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়া (الحكومة الإسلامية), পৃ. ৮৬ – ৮৭।

নং ধারার ভাষ্য হল: “রাষ্ট্রের সরকারী মাযহাবের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের বিপরীত কোন নিয়ম-কানুন জারি করার ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় মজলিসে শুরা) সংরক্ষণ করে না ...।”

আর যখন জা‘ফরীয় একাদশ ইমাম আনুমানিক ১১শ শতাব্দীর দিকে মারা যায়, আর জা‘ফরী আকীদার মতে, দ্বাদশ ইমাম হলেন মাহদী, শিয়া আলেমদের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতে যিনি তার পাঁচ বছর বয়সে আত্মগোপন করে আছেন এবং তিনি মারা যাননি। আর অচিরেই তিনি শেষ যামানায় আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তার অদৃশ্যমান থাকাবস্থায়ই ক্ষমতার উত্তরাধিকারে তার হক প্রতিষ্ঠিত আছে, এ জন্যই ইরানের সংবিধানের পঞ্চম ধারার সুস্পষ্ট বক্তব্য হল: “ইমাম মাহদীর অবর্তমানে (খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহ তা‘আলা তাকে মুক্ত করুন) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতির শাসনক্ষমতা ‘ন্যায়পরায়ণ ফকিহ’ এর হাতে থাকবে ...।”

এই হল শিয়া আলেমগণের বক্তব্য; কিন্তু মুসলিম আলেমগণের অধিকাংশ আলেম বলেন, শাসনব্যবস্থায় উত্তরাধিকারতন্ত্রের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করাটা একটি বিরোধপূর্ণ বিষয়। তাহলে যে ব্যবস্থার মধ্যে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সব ক্ষমতা উত্তরাধিকার ভিত্তিতে হয় এবং তার উত্তরাধিকারী হয় নয়,

আট বা পাঁচ বছরের শিশু সেটা কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এই জন্য তারা [আহলে সুন্নাতের আলেমগণ] এই ধরনের ব্যবস্থাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে, আল-কুরআনের কোন একটি আয়াত অথবা কোন একটি বিশুদ্ধ হাদিসে এর ভিত্তি নেই। বরং তা শুরা বা পরামর্শ করে নেতৃত্ব (ইমামত) নির্বাচন নীতির সাথে সাংঘর্ষিক, আল্লাহ তা'আলা যে নীতির প্রশংসা করেছেন এবং আল-কুরআনুল কারীমের মধ্যে যার নির্দেশ দিয়েছেন।[48]

আর মুসলিম আলেমগণ দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল প্রকার ভুল-ক্রটি ও অবহেলা থেকে পবিত্র এবং সকল প্রকার দোষ-ক্রটি, অপূর্ণতা ও অভাব থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যাকে পাপমুক্ত রেখেছেন সে ব্যতীত সৃষ্টির মধ্যে কেউ নিষ্পাপ নয়; সুতরাং নিষ্পাপ হলেন নবী ও রাসূলগণ, যাঁদের নিষ্পাপ হওয়াটা সীমাবদ্ধ আমানতের সাথে তাঁদের রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার উপর; আর তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পৃক্ত গুনাহ থেকে নিষ্পাপ এবং তাঁরা যে দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তার বিরোধিতা করা বা বিপরীত চলা থেকে মুক্ত। এগুলো ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে রাসূলের ইজতিহাদী

[48] সূরা আশ-শুরা: ৩৮ ; সূরা আলে ইমরান: ১৫৯।

তথা গবেষণাগত ভুল হতে পারে, যেমনিভাবে আল-কুরআন আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনাচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা ‘আবাসা’র মধ্যে তিরস্কার করেছেন, যখন তিনি তাঁর অন্ধ সাহাবীকে উপেক্ষা করেছেন।[49]

আর ‘ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানের বিষয়টি যার জন্য নির্দিষ্ট সে বিষয়ে কথা হল, যদি মুসলিম ব্যক্তি আল-কুরআনুল কারীম পাঠ করে, তবে সে বহু আয়াত পাবে যেগুলো এই প্রকারের জ্ঞানকে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা আ‘রাফের ১৮৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ۝١٨٨﴾ [سورة الأعراف: ١٨٨]

[49] সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৮২।

“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ব্যতীত আর কিছুই নই।”[50]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতের প্রতিনিধিত্ব করে ইমাম ত্বাহাবী এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছেন, যারা কোন একজন মানুষকেও নবীদের চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস করে।[51] সুতরাং তাদের ব্যাপারে বিধানগত অবস্থা কী হবে, যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জন্য এককভাবে নির্ধারিত গুণাবলীর অংশবিশেষ মানুষের জন্য দাবি করে; যেমন ‘ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান, পরিপূর্ণভাবে নিষ্পাপ হওয়া এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রয়োজন নেই বলে নির্দেশ দেয়ার পরও তাদের আনুগত্য করা?!

[50] সূরা আল-আ‘রাফ: ১৮৮।

[51] আল-‘আকিদাতুত ত্বহাবীয়া (العقيدة الطحاوية), পৃ. ৫৭৭।

আর বিশেষ করে দ্বাদশ ইমাম যার ব্যাপারে শিয়া আলেমদের বিশ্বাস হল, তার হায়াতের সীমাবদ্ধতা প্রায় ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত!!!; অথচ অধিকাংশ ঐতিহাসিক দৃঢ়তার সাথে বলেন, শিয়াদের একাদশ ইমামের কোন সন্তান বা বংশধরও নেই।[52] এমনকি যেসব হাদিস মাহদী ও শেষ যামানায় তার আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন এবং বিশুদ্ধ হাদিসের গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেন নি, সেসব হাদিসসমূহের ভাষ্য হল: তার নাম হবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের মত এবং তার পিতার নাম হবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহর নামের মত; অথচ তাদের নিকট দ্বাদশ ইমামের নাম হচ্ছে, মুহাম্মদ আল-মাহদী ইবন হাসান। আর ঐসব হাদিস এ কথাও বলে যে, তার আগমন ঘটবে হাসানের বংশ থেকে; হোসাইনের বংশ থেকে নয়।[53]

[52] আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্ শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدرية), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

[53] ইবনু আছীর আল-জাযারী, জামে‘উল উসূল ফী আহাদীসের রাসূল (جامع الأصول في أحاديث الرسول), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০ – ৩৩২।

তাছাড়া সেখানে এমন কোন দলিল নেই যে, মাহদী প্রায় ১২ শতাব্দী পর্যন্ত জীবন পাবেন।

হে ভাই ও বোনেরা! শিয়া আলেমগণ তথাকথিত 'ইমামত' তথা নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমানের অন্যতম রুকন বলে বিবেচনা করে। অর্থাৎ যে মুসলিম ব্যক্তি এর প্রতি বিশ্বাস রাখবে না, সে কাফির হয়ে যাবে। অপরদিকে তাদের তথাকথিত 'ইমামত'-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার যে বিভিন্ন মাত্রা ও পর্যায় রয়েছে তার উপর ঈমান আনলে তা শীঘ্রই মুসলিম ব্যক্তিকে কাফিরে পরিণত করবে (আল্লাহ আমাদেরকে শিরক ও কুফর থেকে আশ্রয় দিন); অধিকাংশ মুসলিম আলেম আল-কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তের উপর ঐক্যমত পোষণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ মুসলিম আলেম কর্তৃক এই হুকুম প্রদানের পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই এবং তারা এর দ্বারা নির্দিষ্ট কোন পরিবার অথবা কোন দলের পক্ষাবলম্বন করেন না।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত দ্বারা সফলতা লাভের পথ নির্বাচনে জোরদার হও ঐ দিন আগমনের পূর্বে, যেই দিনে জাতীয়তাবাদ উপকার করতে পারবে

না কোন জাতির; আর কোন সৃষ্টিও উপকার করতে পারবে না কোন সৃষ্টির।

আহলে বাইত (নবী পরিবার)

আহলে বাইত তথা নবী পরিবারকে শিয়া আলেমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট কন্যা ফাতেমা, তার স্বামী আলী, তার দুই পুত্র হাসান ও হোসাইন এবং হোসাইনের বংশীয় নয় জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পছন্দ করে; যিনি (হোসাইন) ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন পারস্য সম্রাট এযদাজারদের কন্যার (শাহবানু) সাথে; আর তারা (শিয়াগণ) নবী পরিবারের ঐসব সদস্যদের সাথে এমন সব গুণাবলী নির্দিষ্ট করে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে; উদাহরণস্বরূপ উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, নিষ্পাপ হওয়া, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান থাকা.. ইত্যাদি।

অতঃপর তারা বিভিন্ন যুগের মুসলিমদের খলিফা ও বিচারকদের উপর গাফলতির অপবাদ এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ের ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করে। আর অন্যান্যদের সাথে তাদের এই ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত করেন

সম্মানিত সাহাবাগণকে (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম); তবে তিনি ব্যতীত, যিনি শিয়া আলেমদের নিকট অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহায্য করেছেন এবং কোন বিষয়ে কখনও তার বিরোধিতা করেননি। [অর্থাৎ শুধুমাত্র এ কয়েকজনকেই অপবাদমুক্ত রাখেন; বাদবাকী সকল সাহাবীর প্রতিই গাফিলতির অপবাদ দিয়ে থাকেন।]

অথচ অধিকাংশ মুসলিম আলেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেককে আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেন, যার জন্য সাদকার মাল গ্রহণ করা হারাম বা নিষিদ্ধ; আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার, জাফর রা. ও তাঁর পরিবার, আকিল রা. ও তাঁর পরিবার এবং আব্বাস রা. ও তাঁর পরিবার।[54]

যেমনিভাবে মুসলিম আলেমগণ সূরা আল-আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকে আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে

[54] সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫১ - ৭৫২, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭৩।

গণ্য করেন। কারণ, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣﴾ [سورة الأحزاب: ٣٣]

"আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরেকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে।"[55]

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ হলেন প্রত্যেক মুমিনের মা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-আহযাবের ৬ নং আয়াতে বলেন:

[55] সূরা আল-আহযাব: ৩৩।

﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡ ... ﴾ [سورة الأحزاب: ٦]

"নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা ...।"[56]

যেমনিভাবে আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের কাউকে বাদ না দিয়ে সৎকর্মশীল সবার জন্য মুসলিম আলেমদের নিকট রয়েছে উন্নত মর্যাদার স্বীকৃতি। মুসলিম র. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে,[57] যায়েদ ইবন আরকাম রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খুম' নামক কূপের কাছে দাঁড়িয়ে বলেন:

« ... فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ « وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ». [أخرجه مسلم]

[56] সূরা আল-আহযাব: ৬।

[57] সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭৩।

“... আমি তো শুধু একজন মানুষ, অচিরেই আমার প্রতিপালকের (মৃত্যুর) দূত এসে যাবেন, অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দেব; আর আমি বিদায় বেলায় তোমাদের মধ্যে দু’টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি: তার প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, যাতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে; সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর।” সুতরাং তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি উৎসাহিত করলেন; অতঃপর বললেন: “অপরটি হল আমার পরিবার-পরিজন; আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।” সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সে সময়ে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশও দিয়েছেন। আর এটা তাঁর চরিত্রের পরিপূর্ণতার নিদর্শন, কেননা তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আর মুসলিম আলেমগণ অভিমত পেশ করেন যে, নবী পরিবারের জন্য এ ধরনের সম্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ নয়; বরং এটি

[নবী পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন] সাহাবীগণ এবং সর্ব যুগের ও সকল স্থানের সৎকর্মশীল মুমিনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিকেই আহ্বান করে।

হে ভাই ও বোনেরা! আমরা মুসলিমগণ কি সত্যিকার অর্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাকি কন্যাগণ, তাঁর নিকটাত্মীয় সকল এবং তাদের সৎকর্মশীল বংশধরগণকে (নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত না করে) এড়িয়ে যেতে সক্ষম হব? আমরা কি সত্যিকার অর্থে আহলে বাইত তথা নবী পরিবারকে শিয়া আলেমদের পছন্দমত সীমিত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারি? তারা কি আহলে বাইতের সৎকর্মশীল সদস্যদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান এবং হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামকে অভিশাপ দেয়ার বিষয়টি আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়? আর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কোন বিধান প্রযোজ্য হবে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই কন্যাকে বিয়ে করেছেন এবং তাদের একজনের পক্ষ থেকে তাঁর একটি ছেলেও রয়েছে? আর তার বংশধরের ক্ষেত্রেই বা কোন বিধান প্রযোজ্য হবে? আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম নাতী হাসান রা.-এর বংশধরের ক্ষেত্রেই বা কোন বিধান প্রযোজ্য হবে? তোমরা কি

বিশ্বাস কর না যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর বংশের সৎকর্মশীলগণই সর্বপ্রথম এই বাড়াবাড়িকে অপছন্দ করে, যা প্রকৃত ভালবাসাকে তার বিপরিতমুখী করে তোলে? চিন্তা করুন, কোন মানুষ যখন কারও প্রশংসা করার ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি করে যা শুনলে প্রত্যেক শ্রোতারই ঘৃণার উদ্রেক করে; তখন কি তা প্রশংসার নামে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও নিন্দা করার নিকটবর্তী নয়?

সাহাবা

ইরানের শিয়া আলেমগণ বলে থাকে যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম দুই খলিফা আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন হাদিসসমূহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে; এমনকি তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের আলোকে আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর সম্পন্ন করেছেন; (নাউযুবিল্লাহ) যেমনিভাবে তারা আরও বলে থাকে যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম তিন খলিফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া তাঁদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।[58]

ইরানস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইসলামী শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে[59] যাতে সাহাবায়ে কেরামের প্রজন্মকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে:

[58] মাহাদী আল-‘আসকারী, পৃ. ৩৪ – ৩৮।

[59] আলী শরীয়তী, পৃ. ২৮ – ৩০।

১. এক দল হলেন তাঁরা, যাঁদের প্রতি শিয়া আলেমগণ সন্তুষ্ট; আর তাঁদের সংখ্যা দুই হাতের আঙুলের পরিমাণ, অর্থাৎ দশ জনের বেশি হবে না।

২. আরেক দল হলেন তাঁরা, যাঁদেরকে লেখক বর্ণনা করেছেন এইভাবে: "নিকৃষ্ট গোষ্ঠী এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের পদতলে আত্মাহুতি দিয়েছে"; এই দলের মধ্যে আলী শরীয়তীর মতে আবদুল্লাহ ইবন ওমর একজন। [নাউযুবিল্লাহ] অথচ তিনি প্রায় চার হাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং সুন্নাহ (হাদিস) সংরক্ষণে ও ইসলাম প্রচারে তাঁর বড় ধরনের ভূমিকা ছিল।

৩. অন্য আরেক দল হলেন তাঁরা, যাঁদেরকে লেখক আলী শরীয়তী বর্ণনা করেছেন এইভাবে: "তারা নিজেদের মান-সম্মান বিক্রয় করে দিয়েছে ... এবং প্রতিটি হাদিস এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রিয় করে প্রচুর মুদ্রা সঞ্চয় করেছে।" এই দলের মধ্য থেকে আলী শরীয়তী যাঁদের নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁরা হলেন: আবূ হুরায়রা, আবুদ দারদা এবং আবূ মূসা আল-আশ'আরী, [নাউযুবিল্লাহ] অথচ তাঁরা সুন্নাহ (হাদিস) সংরক্ষণে ও ইসলাম প্রচারে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন।

শিয়াদের আধুনিক গ্রন্থপঞ্জির মধ্য থেকে অপর তথ্যসূত্রে বর্ণিত আছে, 'আল-জিহাদ' নামক পত্রিকায় বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আলীর পক্ষাবলম্বন করেছেন; এরপর লেখক আরও একটু বাড়িয়ে বলল, "বরং আমরা এর চেয়ে বেশি লক্ষ্য করেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমসাময়িক প্রজন্ম সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন না, এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারেও যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের চোখ ও কানের সামনে শত শত বা অনুশীলন বা চর্চা করতেন।"

শিয়া জা'ফরীয় অপর এক আলেম বলেন: "আবদুর রহমান ইবন 'আওফ হল সম্পদের পূজারী, ওসমান হল জাত্যাভিমানী শ্রেণীর লোক, খালিদ ইবন ওয়ালিদ হল বেপরোয়া এবং সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস হল তাকওয়া শূন্য ব্যক্তি।"[60] [নাউযুবিল্লাহ]

অপরদিকে মুসলিম আলেমগণ বলেন: সাহাবীদের সকলেই ন্যায়পরায়ণ এবং কোন একজন সাহাবীও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ

[60] আলী শরীয়তী, ফাতেমা হিয়া ফাতেমা (فاطمة هي فاطمة), পৃ. ২০৭।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। আর তাঁরা সকলেই সম্মানের অধিকারী।[61] সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং তিনি বলেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ [سورة آل عمران: ١١٠]

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।"[62]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى

[61] আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্ শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدرية), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

[62] সূরা আলে 'ইমরান: ১১০।

تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ۝١٠٠﴾ [سورة التوبة: ١٠٠]

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহাসফলতা।"[63]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ۝١٨﴾ [سورة الفتح: ١٨]

"আল্লাহ তো মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছে, তাদের অন্তরে যা ছিল তা

[63] সূরা আত-তাওবা: ১০০।

তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।”[64]

একই সূরার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩ ﴾ [سورة الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাব

[64] সূরা আল-ফাতহ: ১৮।

পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে বের হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।”[65]

আরও পাঠ করুন, সূরা আত-তাহরীমের অষ্টম আয়াত এবং সূরা আল-হাশরের অষ্টম, নবম ও দশম আয়াত।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ...» [أخرجه البخاري]

“সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ; অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে (তাবেয়ীগণ); অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত

[65] সূরা আল-ফাতহ: ২৯।

হবে (তাবে তাবেয়ীগণ) ...।”[66]

ইসলামের অনুসারী আলেমগণ এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করেন না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি বা বন্ধুপ্রীতি ছাড়াই রিসালাত প্রচার করেছেন এবং আমানত আদায় করেছেন। আর সাহাবীগণ সামগ্রিকভাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন লোকরাও রয়েছেন, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তাদের শুধু মুমিনেই ভালবাসবে এবং মুনাফিকে ঘৃণা করবে।” অবশ্য এ ভালবাসা দ্বারা সে ভালোবাসা উদ্দেশ্য নয়, যে ভালোবাসা তার সীমালঙ্ঘন করেছে। সে ভালোবাসাও নয় যা পক্ষপাতমূলক ও অন্ধ। কেননা এ ধরণের ভালবাসা মূলত ঘৃণা ও শত্রুতা হিসেবেই বিবেচিত। আর সাহাবীদের মধ্যে এমন সাহাবীও ছিলেন, যিনি আলী ইবন আবি তালিব রা. অথবা নবী পরিবারের অন্যান্যদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন।[67] আর শিয়া আলেমগণ যাদেরকে গালি দেয়, তাদের

[66] সহীহ বুখারী, শাহাদাত (সাক্ষ্য) অধ্যায়, বাব নং- ৯, হাদিস নং- ২৫০৯।

[67] আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্ শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدرية), ৩য় খণ্ড,

মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণও রয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে কাউকে উদ্দেশ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক" অথবা তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন: "তোমরা আমার এবং আমি তোমাদের অন্তর্ভুক্ত" এবং এইভাবে সাহাবীদের মর্যাদা ও ফযিলত প্রসঙ্গে বহু হাদিস রয়েছে।

তবে যেখানেই সাহাবায়ে কিরাম -রিদওয়ানুল্লাহে তা'আলা 'আলাইহিম আজমা'ইন- এর মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, সেখানেই এটা মানতে হবে যে, তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মহৎ উদ্দেশ্য ও ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা বিদ্যমান আছে। আর সেই মতবিরোধ ছিল শুধুই ইজতিহাদ তথা গবেষণাগত, যার জন্য তাঁরা প্রতিদান পাবেন, চাই তাঁরা সঠিক করুক অথবা ভুল করুক। আর তাঁরা সকলেই আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন, আর তিনি সকল বিচারকের মহাবিচারক। আর আমরা তাঁদের বিচার থেকে কী পেতে চাই? আর আমরাই বা কারা যে তাঁদের বিচার করব? অথচ এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক

পৃ. ১১৬ – ১৭৩ ; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫ – ৮৬।

করে দিয়েছেন; কারণ, তিনি আল-কুরআনুল কারীমের দুই জায়গায় বলেন:

﴿تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٣٤﴾ [سورة البقرة: ١٣٤ و ١٤١]

“সেই ছিল এক উম্মত, তা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। আর তোমরা যা অর্জন করেছে তা তোমাদের। আর তারা যা করত, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না।”[68]

একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায় পাঠ করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে; তাতে সে তাঁদের জন্য প্রমাণিত মর্যাদা ও ফযিলত সম্পর্কে জানতে পারবে, আরও জানতে পারবে যে আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেও সঠিকভাবে সক্ষম হচ্ছি না।

হে ভাই ও বোনেরা! আমাদের জন্য কি আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং পরিষ্কাভাবে বিধৃত বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ সত্য বলে

[68] সূরা আল-বাকারা: ১৩৪ ও ১৪১

মেনে নেয়াটা উত্তম হবে, নাকি ঐসব শিয়া আলেমদের কথাকে সত্য বলে মেনে নেয়া উত্তম হবে, যারা সাহাবীদের একটা ক্ষুদ্র অংশকে সম্মান করে এবং দশ লক্ষ সাহাবীকে অসম্মান করে?

আমরা কি নিশ্চিত হতে পারি না যে, সাহাবীগণের সম্পর্কে আমাদের অবস্থান [যে অবস্থান শিয়ারা গ্রহণ করে থাকে, সটা] কী বাস্তবেই আমাদেরকে জান্নাতের পথের দিকে নিয়ে যাবে? আমরা নির্বোধ ও বোকাদের মত কাজকর্ম করা থেকে দূরত্ব বজায় রাখব; আর মনে হয় যেন আমরা ইসলামের শত্রুদের কর্মচারী, যারা সকল উপায়-উপকরণ দিয়ে ইসলামের প্রথম দিকের আমানতপূর্ণ উৎস ও প্রাথমিক শিক্ষকগণ সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করে দিয়ে তাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে রাতদিন কাজ করে যাচ্ছে। আমরা কী স্মরণ করতে পারি না ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. এর বক্তব্য, যাতে তিনি বলেছেন: “যখন তুমি কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ব্যাপারে মন্দ আলোচনা করতে দেখবে, তখন তুমি ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ করবে।” আর ইসহাক ইবন রাহাওয়াই র. বলেন: “যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে গালি দেবে, সে ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে এবং বন্দী করা হবে।”

আর ইমাম মালেক র. বলেন: “যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেবে, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে; আর যে ব্যক্তি তাঁর সাহাবীদেরকে গালি দেবে, সে ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে।” আর কাযী আবূ ইয়া‘লা র. বলেন: “যে ব্যক্তি সাহাবীদেরকে গালি দেওয়াটা বৈধ মনে করে গালি দিয়েছে, সে ব্যক্তির উপর ফিকাহবিদগণের রায় হল সে কুফরি করেছে; আর যে ব্যক্তি হালাল মনে না করে গালি দিয়েছে, সেই ব্যক্তি পাপ করেছে।” আর ইবন তাইমিয়্যা র. বলেন: “যে ব্যক্তি ধারণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর দশ জনের বেশি নয় এমন সংখ্যক সাহাবী ব্যতীত বাকি সকলেই মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছেন অথবা তাঁরা সকলেই অপকর্ম করেছেন, তবে সেই ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।”[69]

আবূ যুর‘আ আর-রাযী র. বলেন: “যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কোন একজনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে দেখবে, তখন জেনে রাখবে যে, সে ব্যক্তি হল নাস্তিক।”

[69] আবূ মুয়াবিয়া মুহাম্মদ, পৃ. ১১ – ১৩

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “যদি কোন ব্যক্তি আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উপর আমাকে প্রাধান্য দেয়, আমি তাকে অপবাদ দাতার শাস্তির পরিমাণ বেত্রাঘাত করব।”

ইবনু হাজার আল-হাইসামী ইমাম মালেক র. থেকে বর্ণনা করেন: “যে ব্যক্তিকে সাহাবীগণ ক্রুদ্ধ করল, সে ব্যক্তি কাফির ...।” ইমাম শাফেয়ী র.ও ইমাম মালেক র.-এর মত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[70]

ইবনু ‘আবেদীন বলেন: “যদি কোন ব্যক্তি শায়খাইন তথা আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে গালি দেয় অথবা উভয়ের ব্যাপারে অপবাদ দেয়, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে এবং তার তওবা কবুল করা হবে না।”[71]

[70] আবূ মুয়াবিয়া মুহাম্মদ, পৃ. ২৫

[71] আবূ মুয়াবিয়া মুহাম্মদ, পৃ. ৬২

তাকীয়া (التقية)

শিয়া আলেমগণ বলেন:

"নিশ্চয় আল্লাহর দ্বীনের দশ ভাগের নয় ভাগ 'তাকীয়া' (التقية)-র মধ্যে; যার 'তাকীয়া' নেই, তার ধর্ম নেই। আর নবীয তথা খেজুর থেকে গ্রহণ করা মদ ও মোজার উপর মাসেহ ব্যতীত সকল বস্তুর মধ্যে 'তাকীয়া' আছে।"[72]

অর্থাৎ- 'তাকীয়া' হচ্ছে মানুষ তার মনের মধ্যে যা গোপন করে রাখে, কথায় ও কাজে তার বিপরীত প্রকাশ করা; যেমন কোন ব্যক্তির অপর কারোর সাথে প্রকাশ্যে ভদ্রতা ও নম্রতা প্রকাশ করে কথা বলা, তবে মনে মনে ও তার একান্ত লোকদের কাছে অভিশাপ দেয়া। এমনকি যদিও সেখানে কোন জোর করার মত

[72] আল-কাফী মিনাল উসূল (الكافي من الأصول), ২য় খণ্ড, প্রকাশকাল: ১৯৬৮, পৃ. ২১৭ – ২১৯।

কারণ নাও থাকে[73]। 'তাকীয়া'র সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে খোমেনী তার গ্রন্থে বলে:

"তাকীয়া'র উদ্দেশ্য হল ইসলাম ও শিয়া মাযহাবকে হেফাযত করা; কারণ শিয়াগণ যদি তাকীয়া'র আশ্রয় গ্রহণ না করত, তবে অবশ্যই শিয়া চিন্তাধারা নিঃশেষ হয়ে যেত।"[74]

অপর অর্থে, শিয়াগণ ব্যতীত অন্যদের বিরুদ্ধে 'তাকীয়া' (التقية)-কে ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে, এমনকি সমস্ত মুসলিমের বিরুদ্ধে। আর তা হবে কেবল শিয়া জা'ফরীয়দের আকিদাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

শিয়া আলেমদের অন্যতম বিজ্ঞ আলেম আত-তাবতাবায়ী বলেন: "শিয়া মাযহাবের মধ্যে 'তাকীয়া' (التقية)-র আকিদা বা বিশ্বাসের শিকড়ের সূত্রপাত হল সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াত থেকে, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[73] আল-কাফী ফিল ফুরু'উ(الكافي في الفروع), ৩য় খণ্ড, প্রকাশকাল: ১৯৬১, পৃ. ১৮৮ – ১৮৯।

[74] আল-খামেনী, পৃ. ১৪৪।

﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨﴾ [سورة آل عمران: ٢٨]

"মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এইরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।"[75]

আর সূরা আন-নাহলের ১০৬ নং আয়াতে তিনি বলেন:

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦ ﴾ [سورة النحل: ١٠٦]

[75] সূরা আলে ইমরান: ২৮।

“কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।”[76]

আর অধিকাংশ মুসলিম আলেম বলেন: আমরা যখন আল-কুরআনুল কারীম নিয়ে গবেষণা করব, তখন আমরা বুঝতে পারব যে, মানুষের অভ্যন্তরে যা আছে, তার বিপরীত প্রকাশ করাটা মুনাফিকের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাকে ঘৃণা করেন; যেমন তিনি সূরা আল-বাকারার ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে বলেন:

﴿ وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ ﴾ [سورة البقرة: ١٤ - ١٥]

[76] সূরা আন-নাহল: ১০৬।

“যখন তারা মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে: আমরা ঈমান এনেছি; আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে: আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি। আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।”[77]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ أَفَتَطۡمَعُونَ أَن يُؤۡمِنُواْ لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٧٦ أَوَ لَا يَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ ٧٧ ﴾ [سورة البقرة: ٧٥ -٧٧]

[77] সূরা আল-বাকারা: ১৪ ও ১৫।

“তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে— যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তারা তা হৃদয়ঙ্গম করার পরও বিকৃত করে, অথচ তারা তা জানে। তারা যখন মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে: আমরা ঈমান এনেছি; আর যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে: আল্লাহ যা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন, তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও? এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না? তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে, নিশ্চিভাবে আল্লাহ তা জানেন।”[78]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ هَٰٓأَنتُمۡ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمۡ وَلَا يُحِبُّونَكُمۡ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱلۡكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ قُلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٩ ﴾ [سورة آل عمران: ١١٩]

[78] সূরা আল-বাকারা: ৭৫ – ৭৭।

“দেখ তোমরাই তাদেরকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না; অথচ তোমারা সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান রাখ, আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে: আমরা ঈমান এনেছি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙুলের অগ্রভাগ দাঁতে কাটতে থাকে। বল, তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর। অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।”[79]

এই জন্য আল্লাহ তা‘আলা ঐসব মুনাফিকদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা মনের ভিতর যা নেই তা প্রকাশ করে বেড়ায়; কেনানা তিনি বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝١٤٥ ﴾ [سورة النساء: ١٤٥]

“মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাবে না।”[80]

[79] সূরা আলে ইমরান: ১১৯।

[80] সূরা আন-নিসা: ১৪৫।

আর তারা (জমহুর ওলামা তথা অধিকাংশ আলেম) মুসলিম ব্যক্তির মনে যা আছে, কথা ও কাজের মাধ্যমে তার বিপরীত প্রকাশ করাটাকে এক ধরনের মিথ্যা ও মুনাফিকীর আলামত বলে বিবেচনা করেন; আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেন:

«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» (أخرجه البخاري).

“মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কিছু আমানত রাখা হয়, তখন সে তা খেয়ানত করে।”[81] অপর এক হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিমুখী ব্যক্তির নিন্দা করেছেন।[82] সুতরাং সর্বজন বিধিবদ্ধ ইসলামী নিয়ম হল, মুসলিমদের উপর মিথ্যারোপ করা হারাম এবং ঘৃণিত কাজ।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতে মনের বিপরীত কথা বলার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, তা শুধু কাফিরদের

[81] সহীহ বুখারী, ঈমান, বাব নং- ২৩, হাদিস নং- ৩৩

[82] সহীহ মুসিলম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০১১

সাথে এবং বিশেষ কোন সংকটকালীন অবস্থায় কৌশল অবলম্বন করার জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।[83]

আর সূরা আন-নাহলের ১০৬ নং আয়াত, যা নাযিল হয়েছে ‘আম্মার ইবন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে; তাতে ‘আম্মারের মত ব্যক্তিকে মনের বিপরীত কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়েছে; আর তা ছিল এমন প্রেক্ষাপট, যাতে তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, হয় তাকে মুশরিকদের শাস্তির অধীনে তার পিতা-মাতার মত মরতে হবে, অথবা মুখে কুফরের ঘোষণা দিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে; অথচ তাঁর অন্তর ছিল ঈমান দ্বারা ভরপুর।

সুতরাং এই ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারটি একেবারে স্বতন্ত্র। তাছাড়া ব্যাপকভাবে এই নীতি অবলম্বন করা বৈধ নয়। অতএব এই ধরনের মিথ্যা ও নিফাকের মধ্যে দীনের দশ ভাগের নয় ভাগ নির্ধারণ করার পেছনে কী যৌক্তিকতা আছে?!

[83] আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্ শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدرية), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩ এবং অন্যান্য নির্ভরযেগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ।

হে ভাই ও বোনেরা! এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন, যদি মুসলিমগণ বাস্তবিক পক্ষে এই কথায় বিশ্বাস করে যে, দীনের দশ ভাগের নয় ভাগ 'তাকীয়া' (التقية)-র মধ্যে আছে, তবে তাতে কী ফায়দা হাসিল হবে? অর্থাৎ- যা মুসলিম ব্যক্তির হৃদয় বা অভ্যন্তরে নেই, তা প্রকাশ করা তার দীনের দশ ভাগের নয় ভাগের সমান; এমতাবস্থায় আপনার পক্ষে কাউকে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে কি?

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! যেসব আলেম এই 'তাকীয়া'র নীতিতে বিশ্বাস করে, তাদের নিকট থেকে আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব কি? তারা যেসব হাদিস অথবা ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করবে, আমরা তা বিশ্বাস করতে পারব কি? যখন কোন মানুষ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের উপর মিথ্যারোপ করাটা তার পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার দীনের মৌলিক অংশের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে, তখন তার বিশ্বস্ততা উপলব্ধি করার কোন উপায় আছে কি? যখন আমাদের মূল লক্ষ্য পরকালীন নাজাত তথা মুক্তি যা স্থায়ী জীবন, তখন আমাদের উচিত শিয়া আলেমদের পেশ করা মিথ্যা বক্তব্য ও অসার তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা বিতর্ক থেকে সতর্ক থাকা।

হে ভাই ও বোনেরা! চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন যে, ‘তাকীয়া’র সুযোগটি শুধু সাধারণ নিয়ম-কানুন থেকেই আলাদা নয়, বরং তা শর্তযুক্তভাবে স্বতন্ত্র সুযোগ। সুতরাং তা অমুসলিমদের সাথে ঢালাওভাবে প্রতারণার সুযোগ দেয় না; কিন্তু ‘আম্মার রা.-এর মত পরিস্থিতির শিকার হলে তাদের সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া বৈধ হবে। আর আয়াতের অর্থ তো এটাই যে, মুসলিম ব্যক্তি মিথ্যা না বলেই ইসলামের শত্রুদের থেকে তার রাগ ও ক্রোধ গোপন করে রাখতে পারে, যখন তার এই রাগ বা ক্রোধ প্রকাশ করাটা ইসলাম অথবা ইসলামী সমাজকে বিপদের সম্মুখীন করবে।

মুত‘আ বিয়ে

শিয়া আলেমগণ মুত‘আ তথা সাময়িক বিয়ে বৈধতার পক্ষে কথা বলে। কারণ, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বৈধ ছিল। শুধু ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাঁর খিলাফত কালে তা নিষিদ্ধ করেছিলেন।[84] আর মুত‘আ বিয়ের উদ্দেশ্য হল শুধু যৌনতৃপ্তি দান। আর মুত‘আ বিয়ের মধ্যে তালাক নেই, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন উত্তরাধিকার ব্যবস্থা নেই এবং স্ত্রীর জন্য রাত্রির অধিকার নির্ধারণ কিংবা ভরণপোষণের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।[85]

অন্যদিকে অধিকাংশ মুসলিম আলেম নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন:

[84] তাবতাবায়ী, পৃ. ২২৭ – ২৩০।

[85] আবদুল হোসাইন আল-আল মাউসুবী, মাসায়েলু ফিকহীয়া (مسائل فقهية), পৃ. ৮১।

১. আল-কুরআনুল কারীম পুরুষ ও নারীর মধ্যে শরীয়ত সম্মত সম্পর্কের নীতিমালা তৈরি করে দিয়েছে এবং তা দুই প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে:

প্রথমত: বিবাহ বন্ধন, যার উপর বিন্যস্ত হয়েছে তালাক, উত্তরাধিকার এবং স্ত্রীর প্রতি রাতের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ভরণপোষণের বাধ্যবাধকতা।

দ্বিতীয়ত: পুরুষ এবং তার অধিকারভূক্ত দাসীগণের মধ্যে সম্পর্ক। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧ ﴾ [سورة المؤمنون: ٥-٧]

“যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভূক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না, আর

কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তার হবে সীমালংঘনকারী।”[86]

২. এই ব্যাপারে সূরা নিসার শুরু থেকে বেশ তাগিদ এসেছে; বিশেষ করে (সূরা নিসার) ২৪ ও ২৫ নং আয়াতে মোহর পরিশোধ করে দেয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়। আর অধিকাংশ মুসলিম আলেম দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ ﴾(তাদের মধ্য থেকে তোমরা যাদেরকে সম্ভোগ করেছ) -এর অর্থ হল বিবাহ বন্ধনের আওতায় থেকে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ভোগ করা। আর এই অর্থে বর্ণিত আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন:

[86] সূরা আল-মুমিনুন: ১ - ৭ ; সূরা মা'আরিজ: ২৮ – ৩১।

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خيرا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا ». [أخرجه مسلم]

"তোমরা নারীদেরকে পরস্পর কল্যাণকামী হও, পরস্পরকে অসিয়ত কর। কারণ, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাঁকা হাড় থেকে; আর হাড়ের মধ্যে বাঁকা হল উপরের হাড়। সুতরাং যদি তোমরা তাকে ভোগ করতে চাও, তবে তাকে ভোগ কর তার বক্রতা নিয়েই। আর তুমি তার বক্রতাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে যাবে; আর তার ভেঙ্গে যাওয়া মানে তার তালাক হয়ে যাওয়া।"[87]

৩. বিশুদ্ধ হাদিসে সাব্যস্ত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত‘আ বিয়ে বৈধ করেছিলেন আকস্মিকভাবে সংঘটিত কঠিন প্রয়োজনের মুহূর্তে; যেমন আল্লাহর পথে জিহাদের মত কঠিন সময়। আর ঐ প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তা নিষিদ্ধ করেছেন; বরং তিনি যখন শেষ বারের মত তা বৈধ

[87] সহীহ মুসলিম, রিদা‘ অধ্যায়, বাব নং- ১৮, হাদিস নং- ৩৭১৯ ; আহমদ আসকালানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী (فتح الباري شرح صحيح البخاري), ৯ম খণ্ড।

করেন, তখন তার পর পরই চূড়ান্তভাবে মুত‘আ বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা আসে। সহীহ মুসলিমে বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ». [أخرجه مسلم]

“হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে (সাময়িক বিয়ের মাধ্যমে) নারীদের ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিলাম; আর আল্লাহ তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যার নিকট তাদের পক্ষ থেকে কোন বস্তু রয়েছে, সে যেন তার পথ উন্মুক্ত করে দেয়; আর তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার মধ্য থেকে কিছুই গ্রহণ করো না।”[88]

সুতরাং বাস্তবে মুত‘আ বিয়ের বৈধতা ছিল একটা সাময়িক বৈধতা এবং মৌলিক নীতিমালা থেকে স্বতন্ত্র। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বতন্ত্র বিধানটি কায়েম করেছিলেন; আর তিনি এই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কারণ, তিনি

[88] সহীহ মুসলিম, বিবাহ (نكاح) অধ্যায়, বাব নং- ৩, হাদিস নং- ৩৪৮৮।

খেয়াল-খুশিমত কোন কথা বলতেন না। তবে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এই ধরনের ক্ষমতার অধিকার সংরক্ষণ করে না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দরজা বন্ধ করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন, যাতে করে তাঁর ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক মুত‘আ বিয়ের নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[89]

আর শিয়া জা‘ফরীয় আলেমদের কথা- ‘মুত‘আ বিয়ের নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি ওমরের পক্ষ থেকে হয়েছিল’; [এটা আসলে ঠিক নয়] কারণ ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. যা বলেছেন, তা হল:

« إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَابْتَغُوْا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ. » [أخرجه مسلم]

[89] আহমদ আসকালানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী (فتح الباري شرح صحيح البخاري), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪ – ১৭৪।

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলের জন্য যা চাইতেন তাই হালাল করতেন; আর আল-কুরআন নাযিল হয়েছে তার স্থান, মান ও অবস্থা অনুযায়ী। সুতরাং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে হাজ্জ ও ওমরা পরিপূর্ণ কর; আর এসব নারীদের বিয়ের পথ অনুসন্ধান কর। কারণ, আমার নিকট এমন কোন ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন নারীকে বিয়ে করেছে, তবে আমি অবশ্যই তাকে পাথর মেরে হত্যা করব।”[90]

আর ওমর রা. ‘আমর ইবন হুরাইসের ঘটনা জানার পর তিনি হারামের ঘোষণাটিকে তাগিদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। [কারণ, উমর রা. এর সময়ে আমর ইবন হুরাইস মদীনায় এসে মুত‘আ করে বসলেন, পরে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়, আর উমর রা. বুঝতে পারেন যে, আমর ইবন হুরাইস তা হরাম হওয়ার ব্যাপারটি জানত না] তাই উমর রা. মূলত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হারাম ঘোষণাটির পুনারাবৃত্তি করছেন তাদের জন্য, যাদের নিকট উক্ত নিষেধাজ্ঞার খবরটি

[90] সহীহ মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, বাব নং- ১৮, হাদিস নং- ৩০০৬।

পৌঁছেনি। [অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রাসূলের নির্দেশকে বাস্তবায়ণ করার জন্যই উমর রা. তা করেছিলেন]

হে ভাই ও বোনেরা! এমন কাজে সত্যিকার অর্থে কোন পার্থক্য আছে কি, যেখানে নারী তার শরীরকে ভাড়ায় দিয়েছে, অথবা পুরুষ কোন নারীর শরীরকে ভাড়ায় নিয়েছে কয়েক মিনিটের জন্য, অথবা কয়েক দিনের জন্য, অথবা কয়েক মাসের জন্য ... যখন এটা পূর্ব থেকে নির্ধারিত হবে যে, এটা কত সময়ের জন্য চলবে? মুসলিম পুরুষ ও নারী কী বিশ্বাস করে না যে, মুত'আ বিয়ের মধ্যে আমাদের মুসলিম বোনদের জন্য বড় ধরনের অপমান নিহিত রয়েছে; আর এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সুযোগ রয়েছে, যে ব্যক্তি স্বামীর দায়িত্বের বোঝা বহন না করেই নারীদেহ উপভোগ করতে চায়? তাতে কি ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয় না?

হে ভাই ও বোনেরা! আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক যে, সম্ভ্রান্ত শিয়া আলেমগণ তাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরকে মুত'আ বিয়ে অনুশীলনের অনুমতি দেয় না। কারণ, তাতে তারা অপমানবোধ করে; অথচ তারা নিজেদের ভিন্ন অন্যদেরকে তার অনুমতি দিয়ে দেয়।

এখনও আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে, যে মুত‘আ বিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট পরিসরে বৈধ করেছেন, তাতে তিনি শর্ত করেন নি যে, নারী মুসলিমা অথবা কিতাবীয় হতে হবে, যাতে সুস্পষ্টভাবে শরয়ী বিবাহ থেকে আলাদা করা যায়। [সুতরাং মুত‘আ বিয়ে মূলত: বিয়ে হিসেবেই স্বীকৃত হতে পারে না; কারণ, তাতে কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি; যেমনটি বৈধ ও শর‘য়ী বিয়ের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছে।]

এই সবের পরেও কিভাবে একজন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে মুত‘আ বিয়ের বৈধতাকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হতে পারে, অথবা সে নিজেই তার অনুশীলন করতে পারে; বিশেষ করে উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যিনা-ব্যভিচার ও মুত‘আ বিয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; উভয়ের মধ্যে শুধু যৌনসম্ভোগ ও পরিতৃপ্তি কামনা করা হয়?!

গাদীর খুম

বিংশ শতাব্দীর শিয়া জা‘ফরীয় আলেমদের অন্যতম বিজ্ঞ আলেম আত-তাবতাবায়ী বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আলী ইবন আবি তালিব হলেন খেলাফতের অধিক হকদার, সে ব্যাপারে উজ্জ্বল দলিল হল গাদীর খুমের ঘটনা। আর যখন আমরা শিয়া আলেমদের কোন একজনের একটি পুস্তিকা অধ্যয়ন করব, তখন আমরা এই একক ঘটনাটির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো[91] পাব:

১. যারা গাদীর খুমের ভাষণে উপস্থিত ছিল, তারা হলেন এক লক্ষের অধিক সাহাবী।

২. জিলহজ্ব মাসের ১২ তারিখ বিদায় হাজ্জ থেকে মদীনায় ফেরার পথে গাদীর খুমের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ প্রদান করেন এবং তাঁর এই ভাষণের কারণ হল এই জায়গায় নিম্নোক্ত আয়াতটির অবতরণ:

[91] নাজাফী, গাদীর খুম, পৃ. ৯ - ১৯ ; তাবতাবায়ী, পৃ. ১৭৮ – ২১৮।

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧ ﴾ [سورة المائدة: ٦٧]

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তুমি প্রচার কর; যদি না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[92]

৩. এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রদান করেন:

ক. অচিরেই তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য দুটি ভারী জিনিস রেখে যাবেন: তার একটি হল আল্লাহর কিতাব, যার এক পাশ থাকবে আল্লাহ হাতে; আর অপর পাশ থাকবে মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে। আর অপরটি হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার; তাঁর প্রতিপালক সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই

[92] সূরা আল-মায়িদা: ৬৭।

উভয়টি কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না তার নিকট হাউজে কাউসার পেশ করা হয়।

খ. আলীর হাত উত্তোলন করার পর তিনি বলেন: "আমি যার বন্ধু ছিলাম, আলী তার বন্ধু।"

গ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: "হে আল্লাহ! তুমি তার বন্ধু হয়ে যাও, যে তার (আলীর) সাথে বন্ধুত্ব করে এবং তুমি তার শত্রু হয়ে যাও, যে তার সাথে শত্রুতা করে।"

ঘ. তিনি আরও বলেন: "হে আল্লাহ! তুমি তার সাথে সত্যকে পরিচালিত কর, যেদিকে সে পরিচালিত হয়।"

এই হল গাদীর খুমের ঘটনা সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের জা'ফরীয় আলেমদের বক্তব্য; এখন এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিম আলেম যা বলেন, সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত[93]।

[93] বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন, মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্ শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدرية), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৪ – ৮৭।

[আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষ থেকে শিয়াদের পূর্বোক্ত দাবীর উত্তর]

১. শিয়া আলেমদের দাবি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হাতেগণা কয়েকজন সাহাবী সহীহ ইসলামের উপর অটল ছিলেন; যাদের সংখ্যা দশের বেশি হবে না।[94] অথচ গাদীরের ভাষণে অংশগ্রহণ করেছে এক লাখের বেশি সাহাবী। অর্থাৎ- এক লক্ষ সাহাবীর সকলেই তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আলী ইবন আবি তালিবকে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছে। এটা কি করে সম্ভব হল? এবং কোন স্বার্থে? আমরা যদি শিয়া আলেমদের কিতাবসমূহও পর্যালোচনা করি, তাতেও এর পিছনে কী স্বার্থ কাজ করেছে তার কোন উল্লেখ পাই না!

২. যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জ সম্পন্ন করেছেন, গাদীর খুমের খুৎবা তথা ভাষণ হয়েছিল

[94] আলী শরীয়তী, পৃ. ২৮ - ৩০ ; আসকালানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী (فتح الباري شرح صحيح البخاري), পৃ. ৩৪ - ৪৩

সে একই বছরের জিলহজ্ব মাসের ১৮ তারিখ; আর সে একই মাসের ৯ তারিখ আরাফার দিনে নাযিল হয়েছে এই আয়াত:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [سورة المائدة: ٣]

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।”[95] সুতরাং কিভাবে (নাযিলের ধারাবহিকতায় আল-কুরআনের) এই সর্বশেষ আয়াতটি ঐ আয়াতের পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব, যাতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীকে রিসালাত পৌঁছানোর[96] নির্দেশ দিয়েছেন?

[95] সূরা আল-মায়িদা: ৩

[96] আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧ ﴾ [سورة المائدة: ٦٧]

“হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তুমি প্রচার কর; যদি না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। — (সূরা আল-মায়িদা: ৬৭)

আর মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলেম জোর দিয়ে বলেন যে, ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ... ﴿٦٧﴾ ﴾আয়াতটি অবতীর্ণ হয় বিদায় হাজ্জের পূর্বে; বরং মক্কা বিজয় ও খায়বরের যুদ্ধেরও পূর্বে।

৩. আর ইবন তাইমিয়্যা জোরালোভাবে বলেন: ভাষণটি শিয়াদের গ্রন্থসমূহে যে শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, তা মিথ্যা ও অপবাদমূলক বাক্য।

বিস্তারিত বিবরণ হল:

ক. প্রকৃত পক্ষে ‘ভারী বস্তুদ্বয়ের হাদিস’ (حديث الثقلين) যা যায়েদ ইবন আরকাম রা. বর্ণনা করেছেন, তা হল:

«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ « وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي

أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ». [أخرجه مسلم]

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘খুম’ নামক পানি সমৃদ্ধ এলাকায় কোন একদিন আমাদের মধ্যে খতিব তথা বক্তা হিসেবে দাঁড়ালেন, অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণকীর্তন করলেন এবং উপদেশ দিলেন; অতঃপর বললেন: “অতঃপর, জেনে রাখ, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তো শুধু একজন মানুষ, অচিরেই আমার প্রতিপালকের (মৃত্যুর) দূত এসে যাবেন, অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দেব; আর আমি বিদায় বেলায় তোমাদের মধ্যে দু’টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি: তার প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, যাতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে; সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর।” সুতরাং তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি উৎসাহিত করলেন; অতঃপর বললেন: “অপরটি হল আমার পরিবার-পরিজন; আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর

কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।”[97]

আর পূর্বে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন শুধু আলী রা. ও তাঁর বংশধরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, তারা অন্তর্ভুক্ত করে আকিল ও তাঁর বংশধরকে, জাফর ও তাঁর বংশধরকে, ‘আব্বাস ও তাঁর বংশধরকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তথা মুমিন জননীদেরকে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, তোমরা আমার পরিবার-পরিজনকে আঁকড়ে ধর, অথবা তারা হেদায়েত ও আলো।

আর হাদিসে যদি এমন কোন অর্থের সম্ভাবনা রাখত, যা বিশেষভাবে তাঁর পরিবার-পরিজনের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করত; তবে তা তাঁর পরিবার-পরিজনের সকলের মধ্যেই হত এবং এর দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে আব্বাসীয় খেলাফতের বৈধতা মেনে নেয়া শিয়াদের উপর আবশ্যক হয়ে পড়ত; আর শিয়াদের গ্রন্থসমূহের পাতায় পাতায় আব্বাসীয়দের যুলুম-নির্যাতন ও অপবাদের যে

[97] সহীহ মুসলিম, ফাদায়েলুস সাহাবা (فضائل الصحابة), বাব নং- ৪, হাদিস নং- ৬৩৭৮।

কালো অধ্যায় রচিত হয়েছে, তার পরিবর্তে শিয়াগণ কর্তৃক আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থাকে সম্মান প্রদর্শন করাটা আবশ্যক হয়ে পড়ত।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসেবে যা বর্ণিত হয়েছে: "আমি যার বন্ধু ছিলাম, আলী তার বন্ধু।" — অনেক হাদিস বিশেষজ্ঞ এই হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তা সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়নি। এমনকি যদি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই হাদিসের বিশুদ্ধতাও প্রমাণিত হয়, তবে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা যে কথা বলেছেন, তার চেয়ে অধিক অর্থবোধক নয়। আল্লাহর বাণী:

﴿ ...فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ٤ ﴾ [سورة التحريم: ٤]

"... তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাগণও তার

সাহায্যকারী।”[98] সুতরাং এটা এমন বুঝায় না যে, সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসী [বা পরবর্তী খলীফা] বরং তারা তাঁর সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বলেননি যে: ‘আমি যার অভিভাবক ছিলাম, আলী তার অভিভাবক’ এবং তিনি এ কথাও বলেননি যে, ‘আমি যার বন্ধু বা অভিভাবক ছিলাম, আমার মৃত্যুর পর আলী তার বন্ধু বা অভিভাবক’। যদি তিনি এ রকম কথা বলতেন, তবে এই অর্থের সম্ভাবনা থাকত যে, তাঁর পরে খেলাফতের অধিকারী হতেন আলী ইবন আবি তালিব রা.। আর বাস্তবে এই মাসআলা প্রসঙ্গে শিয়া আলেমদের বিতর্কটি নিষ্ফল হিসেবে প্রকাশ পাবে, যখন আমরা সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমে যা বর্ণিত আছে, তা পাঠ করব; অর্থাৎ- আবূ বকর, ওমর ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের খেলাফতের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতামত ছিল, কখনও সুস্পষ্ট ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে, আবার কখনও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মাধ্যমে।

খ. শিয়া আলেমদের কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “হে আল্লাহ! তুমি তার বন্ধু হয়ে যাও, যে

[98] সূরা আত-তাহরীম: ৪।

তার সাথে বন্ধুত্ব করেছে এবং তুমি তার শত্রু হও, যে তার সাথে শত্রুতা করেছে।”— হাদিস বিশারদগণ এই হাদিসটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন। তা সত্ত্বেও এটা একটি দোয়া, যা আলী রা.-কে স্বতন্ত্র বা আলাদাভাবে বুঝায় না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকের জন্যই বিভিন্ন প্রকার দোয়া করেন, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

গ. তাছাড়া, শিয়া আলেমদের কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “হে আল্লাহ! তুমি আলীর সাথে সত্যকে পরিচালিত কর, যেদিকে সে পরিচালিত হয়।” — ইবনু তাইমিয়্যা দৃঢ়তার সাথে বলেন, এই দাবিটি মিথ্যা। আর ইবনু তাইমিয়্যার সাথে আমাদেরও প্রশ্ন- এটি কোন সত্য, যা সৃষ্টির সাথে পরিচালিত হয়, যখন সে (হক পথে) পরিচালিত হয়; সৃষ্টিজগতের সকলে তাদের সিদ্ধান্ত, অভিমত ও মনের আবেগ-অনুভূতি আলোকে কথা বলে? বস্তুত: মিথ্যাবাদীগণ [উপরোক্ত কথা না বলে] যদি দাবি করত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট চেয়েছেন, যাতে তিনি আলীকে সত্যপন্থী বানিয়ে দেন, তবে তা হয়ত: যুক্তিসঙ্গত বলে প্রকাশ হত।

এসব সত্ত্বেও আমরা তাবতাবায়ীকে খিলাফতের উত্তরাধিকার ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার আবশ্যকতা নিয়ে বিতর্ক করতে দেখতে পাই; সে বলে:

“নিশ্চয় ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা ধারণা করছে যে, ইসলামের রক্ষক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর কারণে অচিরেই ইসলাম নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় অবশিষ্ট থাকবে; আর এই কারণেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু গাদীর খুমে তাদের আশা হতাশায় পরিণত হয়েছে; কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে খলিফা ও নেতা হিসেবে পেশ করেছেন। আর আলীর পরে নেতৃত্বের মত এই ভারী দায়িত্ব অর্পিত হবে তাঁর পরিবার-পরিজনের ঘাড়ের উপর।”[99]

এখানে তাবতাবায়ী নিজেই নিজের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন; কারণ, তিনি তার নিজ কিতাবের প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলোতে ইঙ্গিত করেছেন যে, ইমামগণ মাযলুম (নির্যাতিত) অবস্থায় জীবনযাপন

[99] তাবতাবায়ী, পৃ. ১৭৯।

করেছেন, নিজেদের জীবন থেকে ক্ষতি বা অনিষ্টতা প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না; সেখানে তিনি এই পৃষ্ঠাসমূহের মধ্যে বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলামের সংরক্ষক ও মুসলিম জাতির নেতা মনোনীত করেছেন। আর আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আল্লাহর রাসূলের খলিফা মনোনীত করার কারণে ইসলামের শত্রুদের আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। তাবতাবায়ী'র কথা অনুযায়ী ইমামগণ যখন তাদের নিজেদের জীবন থেকেই অনিষ্টতা প্রতিরোধ করতে অক্ষম, তখন তারা কিভাবে মুসলিম জাতির ক্ষয়ক্ষতি ও অনিষ্টতা প্রতিরোধে সক্ষম হবেন? আর কিভাবেই বা ইসলামকে রক্ষা করবেন? বিশেষ করে শিয়া আকিদা বলে, ইমামগণ হলেন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী? নাকি এটা পরোক্ষভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি মন্দ মনোনয়নের অপবাদ? أستغفر الله العظيم (আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি)।

আর প্রকৃতপক্ষে শিয়া আলেমগণ তাদের বাড়াবাড়ি ও পক্ষাবলম্বনের ব্যাপারটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মূর্খতাবশত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর খিয়ানতের অপবাদ

দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। কারণ তারা বলতে চান, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মানুষের নিকট রিসালাত তথা আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর পরিবর্তে তাঁর চাচার ছেলেকে (আলীকে) তার থেকে অংশবিশেষ পৌঁছে দিয়েছেন; তাদের রাষ্ট্রীয় ম্যাগাজিন 'আল-জিহাদ' বলে:

"তিনি ইমাম আলীকে বিশেষ অনেক কিছুর মাধ্যমে রাসূল হিসেবে প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ও তার যথার্থতার ... দর্শন থেকে অনেক কিছুর মাধ্যমে তাকে বিশেষিত করতেন এবং তাকে নিয়ে রাতে ও দিনে দীর্ঘ সময় নির্জনে একাকিত্বে থাকতেন ...।"[100]

এমনকি জা'ফরীয় শিয়াদের ইমামগণও নির্লজ্জ মিথ্যাচার থেকে নিরাপদ হতে পারেনি, যখন তাদের সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে তারা বলেছেন, ... নিশ্চয় দীনের দশ ভাগের নয় ভাগ হল 'তাকীয়া' (التقية); যার 'তাকীয়া' নেই, তার দীন নেই।

[100] আল-জিহাদ ম্যাগাজিন (جريدة الجهاد), সংখ্যা- ৫৬, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১২।

আর এর চেয়ে আরও নিকৃষ্ট হল, শিয়া আলেমদের কোন একজন বলে বেড়ায় যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

“আমার পূর্বের খলিফাগণ ইচ্ছাকৃতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন, তাঁর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন এবং তাঁর সুন্নাতকে পরিবর্তন করেছেন। আর আমি যদি এখন মানুষকে বাধ্য করি তাকে পরিত্যাগ করার জন্য, যার নিকট তোমরা ফিরে এসেছ এবং আরও বাধ্য করি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, সে দিকে ফিরে আসতে, তবে অচিরেই আমার চার পাশ থেকে আমার বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং তারা আমাকে একাকী অবস্থায় ফেলে দিয়ে কেটে পড়বে ...। আরও সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, আমি যদি মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর বিধান ও তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেই, তবে অচিরেই তারা আমাকে পরিত্যাগ করবে এবং আমাকে ছেড়ে কেটে পড়বে।”[101]

লক্ষ্য করুন, শিয়া আলেমগণ কিভাবে সম্মানিত সাহাবী মহাবীর আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা বর্ণনা করছে,

[101] মর্তুজা আল-‘আসকারী, পৃ. ৩৭ – ৪১।

যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করেন না; আর মনে হচ্ছে যেন তিনি ভীরু কাপুরুষ, দুনিয়াবী ক্ষমতার পূজা করেন এবং তা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ আল্লাহর বিধান ও তাঁর নবীর সুন্নাতকে বিসর্জন দেন। তবে বিশুদ্ধ কথা হল, অন্ধ বাড়াবাড়ি ও পক্ষপাতমূলক আচরণ এর চেয়ে আরও জঘন্য অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্ম দেয়। সুতরাং আমরা শিয়া আলেমগণকে দেখতে পাচ্ছি তারা তাদের অজান্তেই তাদের ইমামগণের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পরিবর্তে তাদেরকে জঘন্য খারাপ গুণাবলী দ্বারা কলঙ্কিত করছে। ফলে তাদের ভালবাসা হিতে বিপরীত রূপ লাভ করছে। সম্ভবত কোন কোন আলেম সঠিক কথাটিই বলেন এইভাবে: "আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক হচ্ছে, তাদের জন্য এ ধরণের অনুসারী হওয়া। কারণ, তারা তাদের কোন কোন ব্যক্তি বা ইমামকে এমন মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে, যেমনিভাবে বর্তমান যুগের খ্রিষ্টানরা মসীহর মর্যাদা নির্ধারণ করে। [অর্থাৎ যেভাব খ্রিষ্টানরা বলে থাকে যে ইয়াহূদীরা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। যদি সত্যিই তাকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ইয়াহূদীদের হাতে মরতে হয়, তবে তিনি ইলাহ হলেন কী করে? সুতরাং যেভাবে ক্রুশবিদ্ধের কথা বলে খ্রিষ্টানরা মাসীহ ঈসাকে অসম্মানিত করেছে,

তেমনিভাবে আলী রা. কে হকের পথে প্রত্যাবর্তন করতে অক্ষম বলে বর্ণনা করা ও তার পরবর্তী তাদের ইমামগণকে কোন কিছু করতে অসমর্থ বলে প্রকাশ করা একই পর্যায়ের অসম্মান করা]

উপসংহার

সংক্ষেপে বলা যায়, আল-কুরআনুল কারীম ও গ্রহণযোগ্য সুন্নাহর মধ্যে এমন কোন দলিলের অস্তিত্ব নেই, যা শিয়া আলেমগণের অতিরঞ্জন পক্ষপাতিত্ব ও অন্ধ বাড়াবাড়ি নির্ভর মাযহাবকে সমর্থন করে। সুতরাং তারা সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের আকিদা-বিশ্বাসকে সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে:

১. তাদের দাবি আল-কুরআনুল কারীম অপরিপূর্ণ ও বিকৃত; এই দাবিটি স্বাভাবিকভাবেই বিপজ্জনক ও ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনবে বিধায় তারা তা প্রকাশ করে না; কিন্তু তারা তা তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং যারা এই দর্শনে বিশ্বাস করে, তাদের কানে তারা তা ফিসফিস করে বলে থাকে।

২. বহু বানোয়াট হাদিস উদ্ভাবন, অথবা তার (হাদিসের) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অথবা তার ভাষ্য বা বক্তব্য বিকৃতিকরণ;

তারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করত যাতে এগুলোকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মুতাশাবেহ বা অস্পষ্ট আয়াত ছাড়াও মুহকাম তথা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের অর্থ বিকৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, অথবা এগুলোকে তাদের পক্ষপাতদুষ্ট দাওয়াতী কর্মীদের যথার্থতা প্রমাণের ক্ষেত্রে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৩. তাদের বাড়াবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাসমূহ, অথবা তার পরিস্থিতি ও এতদসংক্রান্ত বিষয়সমূহ বানোয়াটভাবে উদ্ভাবন করা, অথবা বিকৃত করা এবং আল-কুরআনুল কারীম ও বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের অর্থ বিকৃতির ক্ষেত্রে তার সাহায্য গ্রহণ করা। যেমনিভাবে তারা তাদের ভিন্ন অন্যদের ঐসব গ্রন্থের দ্বারা দলিল পেশ করে থাকে, যাদের গ্রন্থসমূহের শিয়াদের বানোয়াট কাহিনীসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর শিয়ারা জা'ফরী শিয়া ব্যতীত অন্যান্য যেমন সুন্নীদের গ্রন্থপঞ্জির অংশবিশেষ দ্বারাও কখনও কখনও দলিল-প্রমাণ পেশের অপচেষ্টা করে থাকে, যদিও সে গ্রন্থের লেখক (সুন্নী আলেম) মূলত শিয়াদের মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে সেগুলোর জবাব দেয়ার জন্য তা তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তারা তাদের গ্রন্থেসমূহে উল্লেখ

করেন, সুন্নীদের অমুক অমুক গ্রন্থ এ বিষয়টি সমর্থন করে। অথবা তারা বলে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ এই বিষয়ে আমাদের সাথে একমত হয়েছেন, অথবা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একশ কিতাব উল্লেখিত বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। অথচ যখনই আপনি যেসব গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেসব গ্রন্থসমূহ খুলে দেখা হয়, তখন আপনি দেখতে পাবেন, হয় সেখানে শিয়া কাহিনী বর্ণিত হয়েছে লেখকের পক্ষ থেকে তার জবাব দেয়ার জন্য, অথবা কাহিনীটি মোটেই বর্ণিত হয়নি; অথবা সে কাহিনীটি ভিন্ন প্রকার।

সারকথা হল, যে মুসলিম ব্যক্তি তার দীন ও পরকালে তার গন্তব্যস্থলের ব্যাপারে ভয় করে, তার জন্য উচিত হবে, ঐসব আলেমদের গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং জনগণকে সতর্ক করা, যারা মিথ্যাকে তাদের দীন ও আকিদা-বিশ্বাসের দশ ভাগের নয় ভাগ মনে করে।

শিয়া আকিদার মূল ও প্রধান কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুসলিমদের শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব দিয়েছেন। আর আমরা যদি এই দাওয়াতের সাথে ঐতিহাসিক বাস্তবতার তুলনা

করি, যা দৃঢ়তার সাথে বলে যে, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের পথে আলী নিজে কোন ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেননি, যা তার বীরত্ব ও তাকওয়ার কারণে তার নিকট কাম্য ছিল, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে আমাদের নিজেদেরকে তিনটি সম্ভাবনার সামনে দেখতে পাব[102]:

১. [**প্রথম সম্ভাবনা:**] নিশ্চয় আলী; যিনি আল্লাহভীরু মুত্তাকী; তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন এবং তিনি তার নবীর খেয়ানত করেছেন। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আলী যখন দেখেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন না করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তখন তিনি তা বাস্তবায়ণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন [এবং জোর করে ক্ষমতা গ্রহণ করেন নি] যদি আল্লাহর নির্দেশের বাইরে চলার মধ্যে হিকমত আছে বলে আলী রা. বুঝে থাকেন তখন এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি আল্লাহর চেয়ে অধিক হেকমত বা প্রজ্ঞা সম্পন্ন; (আলী রা. কখনও এ ধরনের বিশ্বাস করতে পারেন না); অথচ এই মারাত্মক বিশ্বাসটিই শিয়াদের আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী ঈমান ও ইসলামের রুকনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। এমন নয় যে, এটি একটি সাময়িক বা অস্থায়ী ব্যাপার।

[102] আমীর ইবরাহিমী, পৃ. ৭ – ২২।

২. [দ্বিতীয় সম্ভাবনা:] নিশ্চয় আলী; যিনি বীর মহাবীর; যিনি আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কোর তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করেন না; তিনি আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবহেলা করেছেন 'তাকীয়া'র নীতি অবলম্বন করে অথবা কাপুরুষতাবশত। কারণ, তিনি আল্লাহর চেয়ে মানুষকে ভয় করতেন বেশি। (নিঃসন্দেহে আলী রা. এ ধরণের এ ধরণের কাজও করতে পারেন না)।

৩. [তৃতীয় সম্ভাবনা ও বাস্তব কথা হচ্ছে]: শিয়াদের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন অভিমত ও চিন্তাধারা এমন দলিল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো হয়েছে, যার সহীহ বা বিশুদ্ধ কোন ভিত্তি নেই; এগুলো শুধু ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর মিথ্যা অপবাদ।

সুতরাং হে আমার মুসলিম ভাই ও বোন! আপনি আপনার নিজের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও যাচাই-বাছাই করে দেখুন, কোনটি আপনার বিবেকসম্মত; আর কোনটি আপনার চিন্তা-চেতনার সাথে যথোপযুক্ত।

আর আল্লাহ হলেন সরল পথের দিশারী

আরবি গ্রন্থপঞ্জি

— আল-কুরআনুল কারীম।

— আল-হোসাইনী, আবদুল্লাহ, *আল-জাদুর আত-তারিখীয়া লিন্ নাসিরীয়া আল-'উলুবীয়া (الجدور التاريخية للنصيرية)*, কায়রো: দারুল ই'তিসাম, ১৯৮০

— আহমদ আসকালানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী (فتح الباري شرح صحيح البخاري)*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফ।

— 'ইজ্জুদ্দীন বালীক, *মিনহাজুস্ সালেহীন (منهاج الصالحين)*, বৈরুত: দারুল কলম, ১৯৭৮

— মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, (ইংরেজি অনুবাদ, ডক্টর মুহাম্মদ মুহসিন খান), আনকারা: হেলাল ইয়ায়েন লারী, ১৯৭৬

— আহমদ আল-ফাউযান, *আদওয়াউন 'আলাল 'আকিদাতিদ দুররুযীয়া (أضواء على العقيدة الدرزية)*, ১৯৭৯

— ডক্টর আবদুল্লাহ গরীব, *ওয়া জায়া দাওরুল মাজূস (و جاء دور المجوس)*, কায়রো: দারুল জলিল প্রকাশনা, ১৯৭৮

— ডক্টর আলী ইবরাহীম হাসান, *আত-তারীখ আল-ইসলামী আল-'আম (التاريخ الإسلامي العام)*, কুয়েত: মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৯৭৭

— মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিসাবুরী, *সহীহু মুসলিম*, দারু ইহয়াউল কুতুবিল 'আরাবীয়া, ১৯৫৫

— ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ্ দীন আন-নববী, *মিনাল আরবা'ঈনা আন-নববীয়া (من الأربعين النووية)*, বৈরুত: দারুল কুরআনিল কারীম, ১৯৭৬ (ইংরেজি অনুবাদ, 'ইজ্জুদ্ দীন ইবরাহীম ও জনসন দাফীয)।

— আবদুর রহমান কাসেম ও তার ছেলে, *মাজমু' ফাতাবী শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা (مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية)*, রাবাত: মাকতাতুল মা'আরিফ, (৩৭ খণ্ড)।

— মান্না'উল কাত্তান, *মাবাহেসু ফী 'উলুমুল কুরআন (مباحث في علوم القرآن)*, বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১

— সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ (فقه السنة)*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৭৭ (তিন খণ্ড)।

— শহীদ ফাউণ্ডেশন, *আদ-দাসতুর আল-ইসলামী লি জমহুরিয়াতে ইরান আল-ইসলামীয়া (الدستور الإسلامي لجمهورية إران الإسلامية)*, ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র, ১৯৭৯

— ইহসান ইলাহী যহীর, *আশ-শিয়া ওয়াস সুন্নাহ (الشيعة و السنة)*, লাহোর: ইদারাতু তরজমানিস্ সুন্নাহ (একাদশ সংস্করণ), ১৯৮২

— আবদুল হোসাইন আল-‘আসকারী, *আল-‘উলুবীউন আউ আন-নাসীরিউন (العلويون أو النصيريون)*, ১৯৮০

— কাযী আবূ বকর ইবনুল ‘আরাবী, *আল-‘আওয়াসেম মিনাল কাওয়াসেম (العواصم من القواصم)*, (ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব), দারুল মা‘আরেফ।

— আহমদ ইবন তাইমিয়্যা, *মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন-নববীয়া ফী নকযে কালামেশ্ শিয়া ওয়াল কাদরিয়া (منهاج السنة النبوية في*

نقض كلام الشيعة و القدرية), রিয়াদ: মাকতাবাতুর্ রিয়াদ আল-হাদীসা, (চার খণ্ড)।

— ইবনু আছীর আল-জাযারী, *জামে'উল উসূল ফী আহাদীসের রাসূল (جامع الأصول في أحاديث الرسول)*, মাকতাবাতুল হালওয়ানী, ১৯৭৮

— মূসা জারুল্লাহ, *আল-ওয়াশী'আ ফী নকদি 'আকায়েদেশ্ শিয়া (الوشيعة في نقد عقائد الشيعة)*, কায়রো: মাকতাবাতুল কায়লানী, ১৯৮২

— *জারিদাতুল জিহাদ (جريد الجهاد)*, সংখ্যা- ৫৬, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

— মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব, *আল-খুতুত আল-'আরিদা (الخطوط العريضة)*, সাউথ বীরনবী, কান্দা: মাজলিসু জমিয়তে মানশুরাতিল হক।

— মুহাম্মদ ইয়াকুব আল-কুলাইনী, *আল-কাফী মিনাল উসূল (الكافي من الأصول)*, তেহেরান: দারুল কুতুব আল-ইসলামীয়া (তৃতীয় সংস্করণ), ১৯৬৮, ১৯৬১

— আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ আল-মাহমুদ, *বুতলানু নিকাহিল মুতা'য়া (بطلان نكاح المتعة)*, দোহা, কাতার।

— আবদুল হোসাইন আল-আল মাউসুবী, *মাসায়েলু ফিকহীয়া (مسائل فقهية)*, বৈরুত: দারুল উন্দুলুস।

— মুহাম্মদ লতিফী আস-সাব্বাগ (বিশ্লেষক), *মুখতাসারুল মাকাসিদিল হাসানা ফী বয়ানে কাসীরুম্ মিনাল আহাদীসিল মুশতাহারা 'আলাল আসিনা লিয্ যারকানী (مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للزرقاني)*, রিয়াদ: মাকতবুত্ তারবিয়াতুল 'আরাবী লিদুয়ালিল খালিজ, ১৯৮১

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

— Al-Askari, Murtaza A., *A Probe into the History of Hadeeth,* Karaci: Islamic Seminary Pakistan, 1980.

— Azami, Muhammad M., *Studies in Hadeeth Methodology and Literatur,* Indianapolis: American Trust Publication, 1977. al-Islamiyah.

— Al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari,* (translated by M. M. Khan), Ankara: Hilal Yayinlari (2nd ed.), 1976

— Center for the Propagation of the Pilgrimage and Other Shrines, *The*

Constitution of the Islamic Republic of Iran, Tehran.

— Khomeini, Imam, *al-Hukoomah al-Islamiyah,* Iran: The Islamic Movement.

— Al- Khomeini, (Hamid Algar, translation and compilation) *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini,* Berkeley: Mizan Press 1981.

— Najafi, I.H., *Ghader-E-Khum,* Tehran: A Group og Muslim Brothers.

— An Nawawi's, Yahya S., (translated by E. Ibrahim et. al) *An Nawawi's Fourty Hadeeth,* Beirut: *the Holy Quraan Publishing House* 1976

— Asifi, Mehdi A., *al-Salat*, Englewood; Islamic Seminary Publications, 1980.

— Al-Sadr, Baqer, *The Awaited Saviour,* Karachi: Islmic Seminary Pakistan 1979

— Muslim, *Saheeh Muslim,* (translated by Hamid Siddiqi), Lahore: Sh. Muhammad Ashraf 1981.

— -------, *Al-Shaheed* (magazine): *The Voice of the Islamic Revolution*, No 75, January 1981

— Shariati, Ali, *Martydom Arise and Bear Witness,* (translated by Ali Gassemy) Tehran: The Ministry of Islmic Guidance.

— Shariati, Ali, *Fatima is Fatima,* (translated by Laleh Bakhtiar), Tehran: The Shariati Foundation.

— Tabatabai, Sayyid Husayn N., *Shi'ite Islam,* Houston: Free Islmic Literatures. Inc. 1979

এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [سورة آل عمران: ١١٠]

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।”—(সূরা আলে ‘ইমরান: ১১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ »

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অশ্লীল কাজ দেখে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিরোধ করে; আর যদি তাতে সে অক্ষম হয়, তবে সে যেন তার মুখ দ্বারা তার প্রতিবাদ করে; আর সে যদি তাতেও

অক্ষম হয়, তবে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা প্রতিরোধের পরিকল্পনা করে; আর তা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা"। — (মুসলিম, ঈমান, বাব নং- ২২, হাদিস নং- ১৮৬)

এই পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, সেসব ধর্মীয় মাসআলার ব্যাপারে খুব সাদাসিধে চিন্তাধারা পেশ করা, যেসব মাসআলার ব্যাপারে শিয়া আলেমগণ অধিকাংশ মুসলিম আলেম ও বিজ্ঞজনদের সাথে মতবিরোধ করেছেন। বিশেষ করে লেখক এই পুস্তিকাটি রাচনা করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি জানেন যে, সেখানে এই দুই গোষ্ঠীর আলেমদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়েছে; কিন্তু তিনি এসব মতবিরোধের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে জানেন না এবং তার আগ্রহ রয়েছে বেশি সময় ব্যয় না করে এই দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে সাদামাটা চিন্তাভাবনা করার। আর এই জন্যই অচিরেই আল্লাহর ইচ্ছায় উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করে সৃষ্ট মৌলিক মতবিরোধের উপর রচিত এই পুস্তিকাটি একটি গরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যাতে তিনি কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, অন্যায় কাজের নিষেধ করা ও

ঐক্যবদ্ধ থাকার যে নির্দেশ করেছেন, সে নির্দেশনা অনুযায়ী করা এই সামান্য চেষ্টা-সাধনা ও শ্রমটুকু গ্রহণ করেন।

প্রকাশক